প্রশিক্ষণ সহায়িকা

মাঠকর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

সূচিপত্র

পাঠ-০১ ..... ৪

HPNSP এর ভিশন - মিশন - কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪

HPNSP এর আওতায় সূচকসমূহের লক্ষমাত্রা ৬

পাঠ-০২ ..... ৮

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৮

স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত এসডিজিসমূহ ১০

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ১২

পাঠ-০৩ ..... ১৩

দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৩

স্বাস্থ্য সহকারী (HA) ১৩

পাঠ-০৪ ..... ১৮

দায়িত্ব কর্তব্য ১৮

স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১৮

সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১৯

পাঠ - ০৫ ..... ২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ২০

পাঠ - ০৬ ..... ২১

Community Clinic সর্ম্পকে সার্বিক ধারনা ২১

পাঠ - ০৭ ..... ২৭

সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে যোগযোগ (এসবিসিসি) ২৭

পাঠ-০৮ ..... ৩১

সহায়ক সুপারভিশন ঃ ধারণা ও গুরুত্ব ৩১

পাঠ-০৯ ..... ৩৫

মনিটরিং চেকলিষ্ট ৩৫

একটি সুপারভিশন চেকলিষ্টের উদাহরণ ৩৬

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট (পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের জন্য) ৩৬

পাঠ ঃ ১০ ..... ৩৮

শিষ্টাচার ৩৮

পাঠ ঃ ১১ ..... ৪০

ছুটির বিধি-বিধান ৪০

পাঠ- ১২ ..... ৪৪

অসংক্রামক রোগ ৪৪

পাঠ- ১৩ ..... ৪৬

আর্সেনিক ৪৬

পাঠ ঃ ১৪ ..... ৪৯
চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) ৪৯
চিকুনগুনিয়া ও এর বিবরণ ঃ ৪৯
চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ: ৪৯
রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা ৫০
পাঠ-১৫ ..... ৫২
অটিজম (Autism) ৫২
পাঠ- ১৬ ..... ৫৮
হাঁপানি (Asthma) ৫৮
পাঠ- ১৭ ..... ৬০
উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension) ৬০
পাঠ- ১৮ ..... ৬৩
ক্যান্সার (Cancer) ৬৩
পাঠ- ১৯ ..... ৬৬
পেপটিক আলসার (Peptic Ulcer) ৬৬
পাঠ- ২০ ..... ৬৮
বহুমূত্র রোগ (Diabetes) ৬৮
অন্যান্য বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস ৬৯
ডায়াবেটিস নির্ণয়ের উপায়- ৬৯
ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ ৭০
পূর্ব মূল্যায়নপত্র ৭৭

S.L	Name & Designation	Place of Posting
01.	Prof. A.H.M. Enayet Hussain ADG (Planning & Development)	DGHS, Mohakhali, Dhaka.
02.	Dr. Samir Kanti Sarker Director (Admin)	DGHS, Mohakhali, Dhaka.
03.	Dr. Ashish Kumar Saha Director	MIS, DGHS, Mohakhali, Dhaka.
04.	Dr. Md. Akhtaruzzaman Joint Chief	Socio-Economic Division, Planning Commission.
05.	Md. Shajahan Assistant Secretary	MOHFW, Dhaka.
06.	Dr. Nirmal Chandra Das Civil Surgeon	Shariatpur
07.	Dr. Khaleda Islam Director	PHC, DGHS, Mohakhali, Dhaka.
08.	Dr. Jeenat Maitry UHFPO	Sadar, Mymensingh.
09.	Md. Bazlur Rahman DC, BHE	DGHS, Mohakhali, Dhaka.
10.	Dr. Parikshit Kumar Parh DCS	Mymensingh
11.	Sayeda Umme Kaosar Ferdousi Assistant Director (Training)	NIPORT, Dhaka.
12.	Dr. Md. Saiful Islam Assistant Director	NIPORT, Dhaka.
13.	Mir Mobarak Hossain UHFPO	Keraniganj
14.	Prof. Dr. Md. Humayun Kabir Talukder	CME, DGHS, Dhaka.
15.	A.B Siddique Training Specialist	ME&HMD, DGHS, Mohakhali, Dhaka.
16.	Dr. Kamal Ahmed Ex. Associate Prof.	IHT, Mohakhali, Dhaka.
17.	A.I Moqbul Ahmed Chief Executive, AimPlus [consultants]	

পাঠ-০১

HPNSP এর ভিশন - মিশন - কৌশলগত উদ্দেশ্য

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মি:
২	ভিশন-মিশনের ভুমিকা ও কৌশলগত উদ্দেশ্য বর্ণনা	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	১৫ মি:
৩	HPNSP এর আওতায় সূচকসমূহের লক্ষমাত্রা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২৫ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

HPNSP এর আওতায় সূচকসমূহের লক্ষমাত্রা

গত ১৯৯৮ সাল হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে খাত ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Sector-wide Approach - SWAp) প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ১৯৯৮ তালের পূর্বেও ১২৮টি প্রকল্পকে প্রতিস্থাপন করে প্রথম কর্মসূচী হিসেবে (১৯৯৮-২০০৩ মেয়াদে হেলথ এন্ড পপুলেশান সেক্টওও প্রোগাম (HPSP) গৃহীত হয়। উক্ত কর্মসূচী সফল বাস্তবায়ন প্রেক্ষিতে ২০০৩-২০১১মেয়াদে দ্বিতীয় কর্মসূচী (HPNSP) এবং ২০১১-২০১৬ মেয়াদে (পরবর্তীতে ছয় মাস মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক) তৃতীয় কর্মসূচী (HPNSDP) ডিসেম্বর 2016 পর্যন্ত মেয়াদ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের ভীশন ২০২১ এর আওতায় দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষে দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণে টেকসই উন্নয়ণ অভিষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে স্বাস্থ্য সেক্টরে জানুয়ারী২০১৭- জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ কর্মসূচী স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচী (হেলথ পপুলেশান এন্ড নিউট্রিশান প্রোগ্রাম-HPNSP)-এর প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশান প্ল্যান (PIP)অনুমোদিত হয়।

স্বপ্নকল্প/ভিশন (Vision) ঃ

বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সুস্থ্য, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ।

মিশন (Mission) ঃ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা খাতে পর্যাপ্ত সুবিধাদি সৃষ্টি এবং সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Objective) ঃ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে সাম্য আনয়ন, গুণগত মান বজায় রাখা এবং সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতাকে ভিত্তি করে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত কৌশলগত উদ্দেশ্যকে অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য - ১ ঃ

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও তত্বাবধানকে শক্তিশালীকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য -২ ঃ

স্বাস্থ্য পদ্ধতির সকল ক্ষেত্রে উন্নততর কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য -৩ ঃ

স্বাস্থ্য সেবায় সাম্যতার ভিত্তিতে জনগণের প্রবেশাধিকার/অভিগম্যতা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জন ত্বরান্বিতকরে টেকসই অর্থায়ণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য -৪ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পদ্ধতি যেমনঃ সার্বিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়কার্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে দক্ষতা শক্তিশালীকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য -৫ঃ

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সকল পর্যায়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টি ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৬ ঃ

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন পরিমাপক ও দায়বদ্ধতা নিরুপন পদ্ধতিতে উন্নয়ন এবং ব্যাপক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির প্রবর্তন ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৭ ঃ

সাম্যের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবাখাতে প্রবেশাধিকার/অভিগম্যতা এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের উন্নয়ন সাধন ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৮ ঃ

স্বাস্থ্যকর জীবনমান গঠন এবং সুস্বাস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ।

কর্মসূচির প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা
- পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেবা
- প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা
- পুষ্টি সেবা
- সচেতনতামূলক কর্মকান্ড
- প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা
- ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন (Reform Issues)
- কর্মশালা / সেমিনার
- তথ্যব্যবস্থাপনা / মানবসম্পদ উন্নয়ন
- মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশান
- গবেষণা এবং
- অবকাঠোমো উন্নয়ন

HPNSP এর আওতায় সূচকসমূহের লক্ষমাত্রা

ক্রমিক নং	নির্দেশক	ভিত্তি বছরের তথ্য (বছরের সাথে উৎস)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ২০২০ অর্থবছর
	প্রভাব / ফলাফল		
১.	**আয়ুষ্কাল**	৭০.৪ (এসভিআরএস ২০১৩)	৭২
২.	মোট প্রজনন হার (নারী প্রতি সন্তান)	২.৩ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২.০
৩.	৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ ((বিডিএইচএস-২০১৪)	৩৭
৪.	১ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৩৮ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২০
৫.	মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৭০ (এমএমইআইজি-২০১৩)	১০৫
৬.	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের অনুপাত (%)	৩২.৬ ((বিডিএইচএস-২০১৪)	২০
৭.	৫ বছরের কম বয়সী খর্বতার অনুপাত (%)	৩৬.৪ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২৫
	আউটপুট		
৮.	প্রসবকালীন চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত পরিচারকের উপস্থিতি হার (%)	৪২.১ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৬৫
৯.	জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%)	৬২.৪ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৭৫
১০.	১২ মাসের মধ্যে সবকটি টিকা প্রদানকারী শিশুর অনুপাত (%)	৭৮ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৯৫
১১.	সম্পদ কুইনটাইল দ্বারা স্বাস্থ্য সুবিধায় জন্ম অনুপাত (সর্বনিম্ন এবং সর্ব্বোচ্চ কুইনটাইলের অনুপাত)	১৫ঃ৬৯.৫ (বিডিএইচএস-২০১৪)	১ঃ৩.৫
১২.	যক্ষ্মা শনাক্তকরণ হার (%)	৫৩ (জিটিআর-২০১৪)	৭৫

উৎস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান HNP লক্ষমাত্রা ও পরিকল্পনা

	সূচক	Value with year	২০১৫	২০২১
	প্রভাব / ফলাফল			
১.	প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল	৬৬.৬ (SVRS ২০০৭)	৬৮	৭০
২.	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার	১.৪ (SVRS ২০০৭)	১.৩	১.০
৩.	মাতৃমৃত্যু হার (MMR) (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	৩২০ (BM MS ২০০১)	১৪৩	৫৭
৪.	শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৫২ (BDHS ২০০৭)	৩২	১৫
৫.	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের অনুপাত	৪১% (BDHS ২০০৭)	৩৩%	২৯%

৬.	মোট জন্মদানক্ষম হার Total fertility rate (TFR)	২.৭ (BDHS ২০০৭)	২.৪%	২.১%
৭.	জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহারের হার		৭৪%	৮০%
৮.	দারিদ্রতা হার (Head count ratio, %)	৩১.৫ (HIES ২০১০)	২২.৫%	১৫.০%

পাঠ-০২

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
Sustainable Development Goals (SDGs)

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-এর প্রাথমিক ধারনা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	১৫ মিঃ
৩	এসডিজি'র মৌলিক বিশেষত্ব ও এসডিজি এর সাথে পার্থক্য । স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত এসডিজিসমূহ ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

ভূমিকা

২০১০ সাল । সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ (এমজিডি) পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেও উচ্চ পর্যায়ের একটি প্ল্যানারী সভা । আলোচনায় প্রাধান্য পায় ২০১৫ সাল পরবর্তীকালে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য নতুন চিন্তার বিষয় । সকল রাষ্ট্রপ্রধান একটি বিষয়ে একমত হন যে, জাতিসংঘই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত, সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক, বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ খোলামেলাভাবে উন্নয়ন বিষয়ক মতামত তুলে ধরতে পারেন, তর্ক-বিতর্ক করতে পারেন । এ থেকেই সূত্রপাত ঘটে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ (Sustainable Development Goal-SDG) নামে পরিচিত ।

ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন ধারাকে সমুন্নত রাখতেই সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) কে বৃহত্তর পরিসরে অধিকতর সুসংঘবদ্ধ ও সময়োপযোগী করে আগামী ১৫ বছরের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে । এমডিজিতে আমাদের অনুকরণীয় সাফল্য ও অর্জনের ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকেও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে ত্বড়িৎ উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য । আমাদের কর্মপরিকল্পনা, শ্রম ও সমন্বয় এর মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রণীত এই সুদূর প্রসারী জয়যাত্রার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

জাতিসংঘ বিশ্বাস করে অশান্তি ও নৈরাজ্যের মাঝে সুদূরপ্রসারী ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব না । পৃথিবীর কোথাও অশান্তি নিয়ে কোনো টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । এসডিজি হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে ।
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি সব নাগরিকের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ জাতিসংঘ । সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে ত্বরিৎ উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য । এসডিজির মাধ্যমে সব মানুষের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সমন্বয় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজে সব ধরনের ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করা হবে ।

লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল ঃ

১. সকল দেশ থেকে সকল ধরনের দারিদ্র দূরীকরণ ।
২. খাদ্য নিরাপত্তা ও টেক্সই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা ।

৩. স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান।
৪. সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্য ও মানসম্মত শিক্ষা এবং সবার জন্য আজীবন শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা
৫. লিঙ্গসমতা অর্জন ও কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
৬. সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সহজলভ্য করা এবং এর টেক্সই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৭. সবার জন্য সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক শক্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত (জ্বালানী/বিদ্যুৎ) করা।
৮. সবার জন্য মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেক্সই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহ প্রদান।
৯. সহজ অবকাঠামোর মাধ্যমে বৃহৎ, টেক্সই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে উৎসাহ প্রদান।
১০. বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্য কমিয়ে আনা।
১১. শহর ও মানুষের বসবাসকে একীভূত, নিরাপদ, প্রাণবন্ত এবং টেক্সই করা।
১২. সম্পদের উৎপাদন এবং ব্যবহারকে টেক্সই করা।
১৩. জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন ও এর প্রভাব রোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৪. সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্রসম্পদের টেক্সই উন্নয়ন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১৫. প্রকৃতি ব্যবস্থাপনার টেক্সই ব্যবহারকে উৎসাহ ও সুরক্ষা প্রদান, বনসম্পদের টেক্সই ব্যবস্থাপনা ও মরুময়তা প্রতিরোধ, বনজ সম্পদের সুরক্ষা ও জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করা।
১৬. টেক্সই উন্নয়নে সমাজের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সবক্ষেত্রে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
১৭. এসডিজির বাস্তবায়নে এবং টেক্সই উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।

চিত্রঃ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা

এসডিজি'র মৌলিক বিশেষত্ব ও এসডিজি এর সাথে পার্থক্য ঃ

১) **সম্পূর্ণতা/Zero-Total Achievement ঃ** ২০১৫ সাল পর্যন্ত এসডিজি'র উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুধা ও অভাবমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অন্তত "অর্ধেক পথ" আগানো। এসডিজি'র লক্ষ্য হলো কাজটি সম্পূর্ণ শেষ করা। এসডিজি বাস্তবায়িত হলে ২০৩০ সাল নাগাদ কোন ক্ষুধা বা খাদ্যভাব থাকবে না Zero Hunger ও Zero poverty।

২) **সার্বজনীনতা/Universalityঃ** সাধারণতঃ ধনী দেশগুলো গরীব দেশগুলোতে আর্থিক সহায়তা দেবে-এই ছিল এমডিজি'র (MDG) বাস্তবতা। এরপর অনেক পরিবর্তন এসেছে বিশ্ব সমাজে। ODA (অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টান্স) এর পরিমাণ ক্রমে শূণ্যে চলে এসেছে। সমস্যাটি দেশ বা জাতিভিত্তিক নয়। কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সকল দেশেই আছে। তাই এসডিজিতে (SDG) সকল দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩) **সর্বব্যাপকতা/Comprehensivenessঃ** এমডিজিতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮টি। দারিদ্রের মূলোৎপাটন, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং সুশাসনকে বিবেচনায় এনে ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরে।

এটিই চূড়ান্ত । টেকসই উন্নয়নের জটিল বিষয়গুলো এমডিজিতে (MDG) সেভাবে স্থান পায়নি, যা এসডিজিতে গুরুত্ব পেয়েছে ।

৪) **ক্ষুধামুক্তির শর্তাবলী/Hunger Issuesঃ** ক্ষুধামুক্তির তিনটি স্তম্ভ আছে । নারীর ক্ষমতায়ন, সকলকে সম্পৃক্তকরণ এবং স্থানীয় সরকারের সাথে অংশিদারিত্ব । এই বিষয়গুলো এমডিজিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায়নি । লিঙ্গ, ক্ষমতায়ন এবং সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলোকে এসডিজিতে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

৫) **অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা/Inclusive Goal-settingঃ** এমডিজি নির্ধারিত হয়েছিল টপ-ডাউন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বনেতাদের অংশগ্রহণে । কিন্তু এসডিজি নির্ধারণে সকল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা বিশ্বে ইতিপূর্বে কখনো হয়নি । প্রায় ১০০ দেশের সাথে মুখোমুখি মত বিনিময় হয়েছে এবং এককোটির অধিক মানুষের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে ।

৬) **দারিদ্রতা থেকে ক্ষুধাকে আলাদাকরণ/Distinguishing Hunger and Povertyঃ** এমডিজিতে ক্ষুধা ও দারিদ্রকে একসাথে MDG1-এ রাখা হয়েছিল । ধনে নেওয়া হয়েছিলো যে, একটি সমাধান হলেই আরেকটির সুরাহা হয়ে যাবে । কিন্তু এসডিজিতে খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তাকে "দারিদ্র" থেকে আলাদাভাবে দেখা হয়েছে ।

৭) **অর্থায়ন/Funding ঃ** এমডিজিতে মনে করা হয়েছিল যে, ধনী দেশগুলো থেকে সহায়তা নিয়ে দারিদ্রতা দূর করা যাবে । কিন্তু বাস্তবে সেটি সফলতা পায়নি । এসডিজিতে টেকসই এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । তাতে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

৮) **শান্তি প্রতিষ্ঠা/Peace Building ঃ** ইতিহাস বলে শান্তিপূর্ণ এবং সুশাসনভুক্ত দেশগুলো অগ্রগতি লাভ করেছে । এ কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধুমাত্র বিরোধপূর্ণ দেশগুলোতেই "দারিদ্রতা" থেকে যাবে । ক্ষুধা ও দারিদ্রতাকে দূর করার জন্য তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি । কিন্তু এটি এমডিজিতে গুরুত্ব পায়নি, এসডিজিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

৯) **মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা/Monitoring, Evaluation and Accountability ঃ** পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে এমডিজিতে কিছুই বলা ছিলো না । এসডিজিতে ২০২০ সালের মধ্যে তথ্য বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে । তাতে জাতীয় পর্যায়ে মানুষের আয়, বয়স, জেন্ডার, নৃতাত্ত্বিক তথ্য, অভিবাসন পরিস্থিতি, ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে মানসম্মত, সময়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বিববরণ তৈরি করা হবে ।

১০) **মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ/Quality Education Ensurance ঃ** এমডিজিতে কেবল সংখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমনঃ ভর্তির সর্বোচ্চ হার, পাশের হার ইত্যাদি । তাতে সংখ্যা বাড়লেও গুণগত মানের পরিবর্তন আশানুরূপ ছিলো না । কিন্তু এসডিজিতে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে একটি "মানবিক বিশ্ব" গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ।

স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত এসডিজিসমূহ

"স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান" (To ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) শীর্ষক ৩ নং পয়েন্টটি সরাসরি স্বাস্থ্যখাতের সাথে সম্পর্কিত ।
এছাড়াও লক্ষ্যমাত্রা নং ২,৪,৫,৬ এবং ৭ - স্বাস্থ্যখাতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ।

এসডিজি নির্দেশক সমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
অভীষ্ট ৩. সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চয়তকরণ		
৩.১	২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত
		প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত
৩.২	২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি	অনূর্ধ্ব-৫ ববছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার
		নবজাতকের মৃত্যুর হার

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
	সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিতজন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা	
৩.৩	২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা	লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্ত সংখ্যা
		প্রতি ১,০০০ জনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা
		প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা
		প্রতি ১০০,০০০ জনে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা
		উপেক্ষিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এমন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা
৩.৪	প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতে সহায়তা করা	হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুহার
		আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার
৩.৫	চেতনাবিনাশী ঔষধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার সহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা	মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহারজনিত ব্যাধির ক্ষেত্রে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা (ঔষধ সম্পর্কিত, মানসিক-সামাজিক পুনর্বাসন ও পরিচর্যা সেবা)
		অ্যালকোহলের ক্ষতিকর ব্যবহার যা জাতীয় প্রেক্ষাপটে বছরে মাথাপিছু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল গ্রহণের পরিমাণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের দ্বারা)
৩.৬	বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা	সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার
৩.৭	২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা	পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী ও এতে সন্তুষ্ট প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) নারীর অনুপাত
		প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার
৩.৮	সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করা সহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ অর্জন	অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবার পরিধি (সাধারণ ও সব চাইতে সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজনন সংক্রান্ত, মাতৃত্বজনিত, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং সেবা সক্ষমতা ও সুবিধায় অধিকারসহ ট্রেসার ইন্টারভেনশনের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় সেবার গড় আওতা সংজ্ঞায়িত)
		প্রতি ১,০০০ জনে স্বাস্থ্য বিমা বা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতাভুক্ত মানুষের সংখ্যা
৩.৯	ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণ ও সংক্রমণে ব্যাধি ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা	খানা ও চারপাশের বায়ু দূষণে সংঘটিত মৃত্যু হার
		দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্য বিধিমালার অভাব জনিত মৃত্যু হার
		অনিচ্ছাকৃত বিষক্রিয়ায় সংঘটিত মৃত্যু হার
৩.ক	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সকল দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন বাস্তবায়ন জোরদার করা	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী বর্তমানে তামাক সেবনের পরিমাণ
৩.খ	মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে ধরনের সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগব্যাধির প্রকোপ বেশি, সে	টেকসই ভিত্তিতে ও সাশ্রয়ীমূল্যে ঔষধ ও টিকা সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
	ধরনের রোগের টিকা ও ঔষধ উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা দান এবং ট্রিপস সমঝোতা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে দোহা ঘোষণা অনুযায়ী আবশ্যকীয় সকল ঔষধপত্র ও টিকা সাশ্রয়ীমূল্যে সকলের জন্য সহজলভ্য করা; উল্লেখ্য, এই ঘোষণায় 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিতে অধিকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত দিক (ট্রিপস)' শীর্ষক চুক্তিতে উদ্ধৃত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নমনীয়তা ও সকলের জন্য ঔষধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করা সহ অন্যান্য সুবিধাদির পরিপূর্ণ ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করা হয়	চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্য খাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার নীট পরিমাণ
৩.গ	উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো, এখাতে দীর্ঘমেয়াদের জন্য জনবল নিয়োগ এবং এদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন	নির্দিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ও বন্টন
৩.ঘ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি নিরসন এবং এ সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে সকল দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরুপ:

১. স্বাস্থ্যসেবায় সুবিধাভোগীদের সম্প্রসারণ (Population coverage),
২. স্বাস্থ্য সেবার ধরণ সম্প্রসারণ (Service coverage),
৩. ব্যয়ের অংশিদারিত্ব ও সেবা প্রাপ্তিতে সেবার ফি হ্রাস করণ (Financila protection),
৪. প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, প্রমোশন (promotion), চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্তসকল বাহ্য সেবা প্রদান,
৫. স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিতকরণ ।

মোট কর্মসূচী ব্যয় (কোটি টাকায়):

(ক)	অনুন্নয়ন (জিওবি)	৭২,০০০,০০.০০ (৬২.৩৪%)
(খ)	উন্নয়ন (জিওবি)	২৪,৬৩৯.১৩ (২১.৩৪%)
(গ)	উপ-মোট(জিওবি)	৯৬,৬৩৯.১৩ (৮৩.৬৮%)
(ঘ)	প্রকল্প সাহায্য (উন্নয়ন)	১৮,৮৪৭.২৩ (১৬.৩২%)
(ঙ)	উপ-মোট (উন্নয়ন)	৪৩,৪৮৬.৩৬ (৩৭.৬৬%)
(চ)	মোট (উন্নয়ন + অনুন্নয়ন)/ (জিওবি + প্রকল্প সাহায্য)	১১৫,৪৮৬.৩৬ (১০০%)

কর্মসূচীর মোট উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়):

ক) জিওবি (উন্নয়ন) : ২৪,৬৩৯.১৩ (৫৬.৬৬%)
খ) প্রকল্প সাহায্য (উন্নয়ন) : ১৮,৮৪৭.২৩ (৪৩.৩৪%)
গ) উপ-মোট (উন্নয়ন) : ৪৩,৪৮৪.৩৬ (১০০%)

পাঠ-০৩
দায়িত্ব ও কর্তব্য

নং	ধাপ	মিডিয়া ও পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মি:
২	মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কিত দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২০ মি:
৩	ইপিআই ও অন্যান্য বিষয়ক দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২০ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

স্বাস্থ্য সহকারী (HA)

পদের নাম : স্বাস্থ্য সহকারী

১। মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ৩ দিন করে কমিউনিটি ক্লিনিকে বসবেন । কে কোন দিন বসবেন তা স্থানীয়ভাবে ঠিক করতে হবে । অফিস সময় হবে সকাল ৯:০০ টা হইতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা ।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের দায়িত্ব কর্তব্য নিম্নরুপ-

- কমিউনিটি গ্রুপ গঠনে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে সহযোগীতা প্রদান । কমিউনিটি গ্রুপের একজন ভোটবিহীন সদস্য হিসাবে গ্রুপের সভায় উপস্থিত থাকা এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের অনুপস্থিতিতে গ্রুপের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন ।
- বছরের প্রারম্ভে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, এবং কমিউনিটি গ্রুপ এর সাথে আলোচনাক্রমে একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে দায়িত্ব পালন এবং ৩ মাস পর পর মূল্যায়ন সভায় অংশগ্রহন করা ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে ক্লায়েন্ট ফ্লো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাড়ি পরিদর্শন কালীন সময়ে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা ।
- কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের অনুপস্থিতিতে স্বাস্থ্য সহকারী/পরিবার কল্যাণ সহকারী কমিউনিটি ক্লিনিকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা ।
- স্বাস্থ্য সহকারী/পরিবার কল্যাণ সহকারী একে অপরের অনুপস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল সেবা নিশ্চিত করা ।
- ক্লিনিকে আগত সকল রোগীকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে নিবন্ধিত করা ।
- সাধারণ রোগীদের নির্দিষ্ট মান ও গুণসম্পন্ন সেবা প্রদান করা ।
- সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, হাপানী, চর্মরোগ এবং চোখ, দাত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক ঔষধ প্রদান করা ।
- অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধিতকরণ ও সম্ভাব্য প্রসব তারিখ সংরক্ষণে সিএইচসিপিকে সহযোগীতা করা ।
- গর্ভবতী ও প্রসুতি মহিলাদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসব-উত্তর সেবা এবং নবজাতকের সাধারণ সেবা প্রদন করা ।
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ যেমন, কনডম, পিল ইত্যাদি বিতরণ করা ।
- ৫ বৎসরের নীচে শিশুদের আইএমসিআই প্রটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা । পুষ্টিহীনতা সনাক্ত করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবাপ্রদান এবং মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতাল বা আই এম সি এ কর্ণারে রেফার করা ।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী কর্তৃক ব্যবস্থা থাকা সাপেক্ষে কমিউনিটি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারী করা ।

- সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদান পূর্বক দ্রুত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করা ।
- সন্দেহভাজন যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগী সনাক্ত করা এবং পরীক্ষার ও চিকিৎসার জন্য যথাযথ কেন্দ্রে প্রেরণ করা ।
- মাসে একদিন ইপিআই কেন্দ্র পরিচালনা করা এবং আগত মহিলা ও শিশুদের টিকা প্রদান করা ।
- মাসে একদিন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর (সন্দেহভাজন যক্ষা রোগীর কফ সংগ্রহের জন্য) এসমিয়ার সেন্টারে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে সহযোগীতা প্রদান করা ।
- ফাইলেরিয়া কবলিত এলাকায় মাসে একদিন গোদ(ফাইলেরিয়া) রোগীদের সেবা প্রদান করা ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি পান, সুষম খাদ্যাভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের (BCC) জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা ।
- প্রয়োজন ও সম্ভব হলে কমিউনিটি ক্লিনিকে বেলা ১:০০ টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে জানিয়ে আইপিসি করার জন্য কর্ম এলাকায় আইপিসি/বাড়ি পরিদর্শন করা ।
- ক্লিনিকের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য স্থাপনাসমূহের তালিকা/ হিসাব সংরক্ষণ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ উহাদের যথাযথ রক্ষকণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারকে সহযোগীতা করা ।
- ঔষধ ও আবশ্যক দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় এবং সেগুলি সংগ্রহের জন্য সময়মত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইনডেন্ট প্রেরণ করতে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারকে সহযোগীতা করা ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের বর্জ্য পদার্থের (বিশেষত: ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও নিডল) নিরাপদ অপসারণ করতে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারকে সহযোগীতা করা ।
- তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তাহা উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে প্রেরণ করতে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারকে সহযোগীতা করা ।

২। ইপিআই সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

- **বছর শুরুর পুর্বে ইপিআই মাইক্রোপ্লান তৈরীর সময় করনীয় কাজ ঃ**
  কর্ম এলাকার জনসংখ্যা অনুযায়ী সাব-ব্লক ভিত্তিক টিকা গ্রহণের যোগ্য শিশু ও মহিলা টার্গেট নির্ধারণে সহযোগীতা করা । প্রয়োজনে সাব-ব্লক পুনর্বিন্যাস করা ও অস্থায়ী টিকা-কেন্দ্র পরিবর্তন করা।
- **টিকাদান সেশন আয়োজনের পুর্বে বাড়ি পরিদর্শনের সময় করণীয় কাজ**
  - বাড়ি পরিদির্শনের পূর্বে রেজিস্ট্রেশন বই দেখে পরবর্তী সেশনে টিকা পাবার যোগ্য সকল শিশু ও মহিলা এবং গত সেশনে বাদ পড়া শিশু ও মহিলা চিহ্নিত করা ।

বাড়ি পরিদর্শনের সময় করণীয় কাজ

- ✓ **কার্ড চেক করা :** যেসব বাড়িতে ১ বৎসরের কম বয়সী শিশু ও ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী মহিলা আছে তাদের টিকাদান কার্ড এবং তা যথাযথ ভাবে পূরণ করা আছে কি না দেখতে হবে ।
- ✓ **ডুপ্লিকেট কার্ড প্রদান করা :** কেউ টিকা কার্ড হারিয়ে ফেললে তাকে রেজিস্ট্রেশন বই দেখে একটি ডুপি-কেট কার্ড লিখে দিতে হবে ।
- ✓ **পুরনো রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা :** রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এমন কেউ যদি অন্য কেন্দ্র থেকে টিকা নিয়ে থাকে তাহলে তার কার্ড চেক করে রেজিস্ট্রেশন খাতায় লিখে নিতে হবে ।
- ✓ **নতুন রেজিস্ট্রেশন করা :** কখনোই টিকা গ্রহণ করে নাই এমন সকল লেফট আউট শিশু ও মহিলার এবং জন্মের সংগে সংগে ৪২ দিনের মধ্যে শিশুর নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । শিশুকে রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রসূতি মাকে ভিটামিন "এ" খাওয়াতে হবে এবং শিশুদের ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক জন্মনিবন্ধনে সহযোগীতা করতে হবে ।
- ✓ **টিকাদানের দিন ও তারিখ সম্পর্কে অভিহিত করা :** পরবর্তী সেশনে টিকা পাবার যোগ্য সকল শিশু ও মহিলা এবং গত সেশনে বাদ পড়া শিশু ও মহিলাদের টিকাদান কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।
- ✓ **টিকাদান কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন সম্পর্কে অভিহিত করা :** কোন কারণে টিকাদান কেন্দ্র পরিবর্তন করলে স্থানীয় জনগণকে পরিবর্তিত স্থান, তারিখ ও সময় সম্পর্কে জানাতে হবে ।

- ✓ **পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা সম্পর্কে খোঁজ নেয়া :** টিকার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অভিভাবককে বুঝিয়ে বলতে হবে এবং খোঁজ নিতে হবে। জটিলতা হলে তাকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে হবে।
- ✓ **রোগ নিরীক্ষণ তথ্য সংগ্রহ করা :** এলাকায় এএফপি, নবজাতকের ধনুষ্টংকার এবং হাম রোগী অছে কি না তা খোঁজ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হবে।

- **টিকাদান কেন্দ্রে করণীয় কাজ ঃ**

সপ্তাহে ২ দিন ও মাসে ৮ দিন একটি সাবেক ওয়ার্ডের ৮টি সাব-ব্লকে অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র (আউটরিচ সেন্টার) পরিচালনা করা।

- টিকাদান শুরুর পুর্বে রেজিস্ট্রেশন বই দেখে টিকাদানের দৈনিক টালিবইয়ে প্রতিটি টিকার জন্য প্রাপ্য মহিলা ও শিশুর নাম তুলে সেইদিনের লক্ষ্যমাত্রা লিখে রাখা।
- টিকাদান কেন্দ্রে আগত মহিলা ও শিশুদের দৈনিক টালিবই, রেজিস্ট্রেশন বই ও টিকা কার্ড দেখে টিকার প্রাপ্যতা অনুযায়ী টিকা প্রদান করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি মায়েদের ভিটামিন "এ" খাওয়ানো।
- সেশনের মাঝামাঝি সময়ে দৈনিক টালিবই পর্যালোচনা করে বাদ পড়া মহিলা ও শিশুদের কেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা করা।
- সময় ও সুযোগমত কেন্দ্রে আগত মহিলা ও অবিভাবকদের গ্রুপ করে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা।

- **মাস শেষে টিকা প্রদানের রিপোর্ট নির্দিষ্ট ফরমে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করা।**
- **ইপিআই রোগ নিরীক্ষণ সম্পর্কিত কাজ**
  - দলীয় সভা/উঠান বৈঠক, শুক্রবার জুম্মার নামাজ, টিকাদান কেন্দ্র এবং বাড়ি পরিদর্শনের সময় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা রোগ তথ্যদাতাদের মাধ্যমে সন্দেহভাজন এফপিআই, নবজাতকের ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত শিশু বা ৩-২৮ দিনের মধ্যে কোন নবজাতকের মৃত্যু এবং হাম রোগের প্রকোপ খোঁজ করে রিপোর্ট করা।
  - এফপিআই রোগীর খোঁজ পাওয়া গেলে পলিও রোগের ভাইরাস সনাক্ত করার জন্য রোগীর পায়খানার নমুনা এবং সন্দেহজনক হাম রোগীর খোঁজ পাওয়া গেলে হাম/রুবেলা সনাক্তের জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে প্রেরণে সহযোগীতা করা। সন্দেহজনক ধনুষ্টংকার আক্রান্ত শিশু বা ৩-২৮ দিনের মধ্যে কোন নবজাতকের মৃত্যুর খোঁজ পাওয়া গেলে তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষকে সহযোগীতা করা।
  - এলাকায় পোলিও, হাম রোগ সনাক্ত হলে ORI এবং ধনুষ্টংকার রোগ সনাক্ত হলে CRI কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

৩। পুষ্টি সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

- **গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য**
  - গর্ভকালীন সময়ে ওজন গ্রহণ ও ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা।
  - গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের নিম্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা
    - ✓ পরিমাণমত প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ ও সময়মত বিশ্রাম গ্রহন
    - ✓ আইএফএ (আয়রন-ফলিকএসিড), ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, সম্পুরক-অনুপুষ্টি ও ভিটামিন "এ" সঠিক সময়ে গ্রহণ
    - ✓ শিশুকে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো
    - ✓ শিশুকে জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো
    - ✓ শিশুর বয়স ৬ মাস পুর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমত উপযুক্ত বাড়তি খাবার খাওয়ানো।

- গর্ভবতী মায়েদের আইএফএ ও ক্যালসিয়াম বড়ি এবং প্রসূতি মায়েদের প্রসবের পর পর ভিটামিন "এ" ও প্রসবের পর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত আইএফএ প্রদান।

- **শিশুদের জন্য**
  - জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর ওজন গ্রহণ এবং ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শারীরিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত Growth Chart পূরণ করা।
  - কম জন্ম ওজন সম্পন্ন শিশুদেরকে সনাক্ত করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা।
  - কম ওজন সম্পন্ন শিশুদের খাওয়ানোর ব্যাপারে মা কে পরামর্শ প্রদান করা।
  - মুয়াক (Mid Upper Arm Circumferance- MUAC) পরিমাপ করে ০-৫ বছর বয়সী অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা এবং CMAM ইপিআই গাইডলাইন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনে নিকটবর্তী SAM কর্ণারে প্রেরণ করা।
  - ডায়রিয়ার চিকিৎসার সময় ORS এর সংগে Zinc ট্যাবলেট প্রদান করা।
- **কিশোর কিশোরীদের জন্য**
  - কিশোর কিশোরীদেরকে কৈশরকালীন সঠিক পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা এবং কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেয়া।
  - কিশোরীদের মাঝে আয়রন বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ করা।

৪। বাড়ি/এলাকা পরিদর্শনকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য

- উঠান বৈঠক পরিচালনা করা। উঠান বৈঠকে-
  - স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সম্পর্কিত এক বা একাধিক বিষয়ে জনগণের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভংগি পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।
  - অংশগ্রহনকারীগণের স্বাস্থ্য সমস্যা জানা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
  - এলাকার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে সেবা নিতে উৎসাহিত করা।
- ইপিআই সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করা।
- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- এলাকায় কোন মহিলা গর্ভধারণ করেছে কি না তার অনুসন্ধান করা ও রেজিস্টারভুক্ত করা।
- প্রসব, জীবিত/মৃত জন্ম, শিশু মৃত্যু, মাতৃ মৃত্যু ও সাধারণ মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজ নেয়া এবং নির্দিষ্ট ফরমে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদান করা।
- ফাইলেরিয়া প্রবন এলাকায় ফাইলেরিয়া ও গোদ রোগীর অনুসন্ধান করা এবং রেজিস্টারভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- সন্দেহভাজন যক্ষা, কুষ্ঠ, কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগীর অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য যথাযথ কেন্দ্রে প্রেরণ করা।
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের ওআরএস দিয়ে চিকিৎসা প্রদান ও প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করা।

৫। অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য

- জাতীয় টিকাদান দিবস, ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইন, জাতীয় কৃমি সপ্তাহ, বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি কর্মসুচীতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা।
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালনে সহযোগীতা প্রদান করা।
- বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগ ও নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে খোঁজ করা এবং প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানো ও প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা।
- দুর্যোগের সময় আপদকালীন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী দ্বারা বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করা।
- ❖ **সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।**

পাঠ-০৪

দায়িত্ব কর্তব্য

স্বাস্থ্য পরিদর্শক

নং	ধাপ	মিডিয়া ও পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২	স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শক এর দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য ।	পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা	৪০ মিঃ
৩	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

ক. জনস্বাস্থ্য, আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (BCC) এবং এনজিও সমন্বয় বিষয়ক ফিল্ডসার্ভিসেস সম্পর্কিত বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)কে সহায়তা প্রদান;

খ. অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ এর আওতায় সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন জনস্বাস্থ্য, আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (BCC) এবং এনজিও সমন্বয় বিষয়ক কার্যবলীর তত্ত্বাবধান;

গ. থানা পর্যায় হইতে ওয়ার্ড/কমিউনিটি পর্যায় পর্যন্ত অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ এর আওতাধীন টিকার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ, ডায়রিয়া জাতীয় ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ (ARI) প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগ/অন্ধত্ব প্রতিরোধ ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে/পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন;

ঘ. মহামারী রোগ বিস্তার প্রতিরোধ এবং আপদকালীন ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

ঙ. কার্যকরভাবে অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ সরবারাহ করার উদ্দেশ্যে গণ-অংশগ্রহণ কার্যক্রমের আয়োজন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ;

চ. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি (Sanitation), খাদ্যাভাস ইত্যাদি সম্পর্কিত আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (BCC) বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

ছ. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাকে সক্রিয় সহযোগীতা প্রদান করা;

জ. তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার নির্দেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক/স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন এবং সে সকল কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত জনস্বাস্থ্য সেবা এবং এতদসম্পর্কিত আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (BCC) কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ;

ঝ. নিজ কাজের মাসিক অগ্রিম পরিকল্পনা (পরিদর্শনসহ) তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাকে প্রদান করা; এবং

ঞ. অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

দায়িত্ব কর্তব্য

সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক

ক. অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ এর আওতায় ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড/কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন জনস্বাস্থ্য (বিশেষ করিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ), আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (BCC) এবং এনজিও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান;

খ. কমিউনিটি ক্লিনিক/স্যাটেলাইট ক্লিনিক হইতে এবং বাড়ীতে গিয়া প্রদত্ত টিকার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ,ডায়রিয়া জাতীয় ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ (ARI) প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগ/অন্ধত্ব প্রতিরোধ ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ;

গ. মহামারী রোগ বিস্তার প্রতিরোধ এবং আপদকালীন ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রমে বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

ঘ. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি (Sanitation), খাদ্যাভাস ইত্যাদি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

ঙ. অধীন মাঠকর্মীদের কাছে ঔষধপত্র ও অন্যান্য উপকরণাদির সরবরাহ পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ এবং সরবরাহ সন্তোষজনক রাখার বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা রাখা;

চ. বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও), স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংগে সমন্বয়ের কাজে তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা দান;

ছ. নিজ কাজের মাসিক অগ্রিম পরিকল্পনা (পরিদর্শণসহ) প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাদের নিকট পেশ করা এবং

জ. অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

পাঠ - ০৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

ICT - Information & Communication Technology

নং	আপ	মিডিয়া ও পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মি:
২	ICT সম্পর্কে সার্বিক ধারনা ও কার্য্য পরিধি ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

বর্তমান বিশ্বে ICT (Information & Communication Technology) জীবনের অংশ । এর মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং আমরা আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারি । আমি একজন মাঠ কর্মী হিসেবে কম্পিউটার এর মৌলিক ধারণা অত্যাবশ্যক । এজন্য MIS, DGHS মহাখালী ঢাকা, স্বাস্থ্য কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে নানাবিধ প্রোগ্রাম কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন ।

যেমন-

HIS - Health Information System

HRM - Human Resource Management

Telemedicine

Complain/Suggestion Box

DHIS 2 - District Health Information System Version – 2

DGHS - এর Web Site [http://www.dghs.gov.bd]

উপরোক্ত বিষয় ভিত্তিক প্রত্যেক বিষয়ে আপনার স্বাস্থ্য কর্মীর ধারনা/জ্ঞান থাকতে হবে । এবং উপরোক্ত বিষয়ের সাথে আপনি মাঠপর্যায়ে যে কাজ করেন, তার জন্য প্রতিবেদন এর মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে হবে ।

কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার কম্পিউটার ব্যবহার ও অনলাইনে প্রতিবেদন প্রদান সহায়িকা এই বই সম্পর্কে অবহিত হবেন ।

DGHS ওয়েব সাইটের ব্যনার

পাঠ - ০৬

Community Clinic সর্ম্পকে সার্বিক ধারনা

নং	আপ	মিডিয়া ও পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২	কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে সার্বিক ধারনা ও কার্য পরিধি ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২৫ মিঃ
৩	CHCP এর দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	১৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয় । এর মধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান/নির্মিত প্রায় ৪,৫০০ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে জনবল পদায়ন এবং আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সহায়ক দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে কেন্দ্রসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে । অবশিষ্ট এলাকার জনগণের জন্য কমবেশী ১৩,৫০০ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারী করে । উক্ত নীতিমালায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধানে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্তকরণের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । এই ব্যবস্থায় সরকার এককালীন অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে এবং ক্লিনিকের যথাযথ পরিচালনা ও সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ঔষধপত্র ও আসবাবপত্রের সরবরাহ/প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করবে । পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্থান নির্বাচন, সরকারের অনুকুলে প্রয়োজনীয় জমিদান, নির্মাণ কাজ তদারকী, দৈনন্দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের দ্বায়িত্ব পালন করবেন । সরকারি পদ্ধতির আওতায় তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের এলাকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত 'কমিউনিটি গ্রুপের' মাধ্যমে ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সহযোগিতা করবে ।

উল্লেখ্য যে, (১৯৯৮-২০০১) পর্যন্ত ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করা হয়, তন্মধ্যে ১০,৬২৪ টি বিদ্যমান আছে এবং ৯৯টি নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান প্রায় ৪,৫০০ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব অধিদপ্তর কর্তৃক কমিউনিটি প্রদেয় সেবাসমূহ দেওয়া হচ্ছে ।

সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালের একনেক সভায় "রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ" (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক ৫ বৎসর মেয়াদী (২০০৯-২০১৪) উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে । প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ২,৮৭৬ টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা এবং ১৩,৫০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) এর নিয়োগ প্রদান করা । উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ই-হেলথ্ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে । তারই অংশ হিসেবে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) কমিউনিটি ক্লিনিক এলাকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ, হালনাগাদ করণসহ কর্মসূচি

বাস্তবায়নের জন্য এগুলি ব্যবহার করবেন। পাশাপাশি উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, রোগী ব্যবস্থাপনা ও রেফারেল বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

সরকারি/বেসরকারি যে কোন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রম নীতিমালা ও নির্দেশনার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে এবং কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় করা হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে মনোনীত/নির্বাচিত কমিউনিটি গ্রুপ। এ গ্রুপ সেবা প্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করবে। এ গ্রুপের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কর্মতৎপরতা কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

১. কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা

১.১. সেবাদাতা ও সেবাদানের সময়

১. শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহে ৬ দিন (শনিবার হতে বৃহস্পতিবার) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক খোলা থাকবে।

২. কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) প্রতি কর্মদিবসে কমিউনিটি ক্লিনিকে উপস্থিত থেকে সেবা প্রদান করবেন এবং কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারী প্রত্যকে সপ্তাহে নূন্যতম ৩ দিন করে (পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে) কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদান করবেন। পরিবার কল্যাণ সহকারী সপ্তাহে ৩ দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ দেওয়া, উদ্বুদ্ধকরণ, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী সেবাগ্রহীতা সংগ্রহপূর্বক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আনায়ন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করবেন। একইভাবে স্বাস্থ্য সহকারী সপ্তাহে ৩ দিন সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত মাঠ-কাজ সম্পাদন করবেন। উল্লেখ্য যে, ইপিআই সেশনে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারী উভয়ে অংশগ্রহণ করবেন।

৩. কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য নির্ধারিত সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিক খোলা রাখতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর মধ্যে কে কবে কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডারকে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদানে সহায়তা করবেন, তা যৌথভাবে প্রণয়নপূর্বক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে। অনুমোদিত কর্মসূচির ১টি কপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরন করতে হবে এবং ১টি কপি কমিউনিটি ক্লিনিক টানিয়ে রাখতে হবে।

৪. কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার উভয় বিভাগের সেবাসামগ্রীসমূহ সরবরাহ নিশ্চিত করবেন এবং এ কাজে তাকে সহযোগীতা করবেন স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী।

৫. সে সকল এলাকায় পুষ্টি কর্মী আছে তারা নিয়ম অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক এলাকার নির্ধারিত কার্যক্রম কমিউনিটি ক্লিনিকে থেকে করবেন, এ কাজে উক্ত কর্মীকে কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও সমন্বয় করবেন। তদ্রুপ চলমান অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমেও সহযোগিতা করবেন।

৬. কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যবৃন্দ কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা প্রদান ও মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবেন।

৭. এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন এমন গ্রাম্য চিকিৎসক, দাই এবং অন্যান্য সেবাদানকারী ও এনজিও কর্মীদেরকে UH&FPO ও UFPO কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সম্পৃক্ত করবেন।

১.২. কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদেয় সেবাসমূহ

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানের প্রাথমিক স্তর হিসাবে গন্য হবে। গ্রামীন জনগণের চাহিদা অনুসারে এই কেন্দ্রগুলির (যা One-stop service center হিসাবে পরিচালিত হবে) মাধ্যমে সহজলভ্য, নির্দিষ্ট মান ও গুনসম্পন্ন সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় উল্লেখযোগ্য সেবাসূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মহিলাদের প্রসব-পূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর ডেলিভারী-পরবর্তী ৪২ দিন) অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোন জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব জরুরি প্রসূতি সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

২. সদ্য প্রসূতি মা (৬ সপ্তাহের মধ্যে) এবং শিশুদের (বিশেষতঃ মারাত্মক পুষ্টিহীন, দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া এবং হামে আক্রান্ত) ভিটামিন-এ ক্যাপসুল প্রদান।

৩. মহিলা ও কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা সনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান, কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান।

৪. ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী শিশুদের প্রতিষেধক (যক্ষা,ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, রুবেলা, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েনজি-বি) এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকাদান, ১৫ বছর বয়সের নীচের শিশুদের মধ্যে সন্দেহজনক এএফপি (১৫ বৎসরের নীচে হাত, পা বা যে কোন অংগ হঠাৎ অবশ বা দুর্বল হওয়া) সনাক্ত করে রেফার করা।

৫. ১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের ৬ মাস পর পর প্রয়োজনীয় পরিমান ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা প্রদান।

৬. আয়োডিনের স্বল্পতা, কৃমি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (ARI), যক্ষা (DOTS সহ), কুষ্ঠ (MDT পর্যানুসরণ), ম্যালেরিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া, ত্বকের ছত্রাক ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান/রেফার কিংবা উচ্চতর হাসপাতাল/ক্লিনিকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে ঔষধ প্রদান/অনুসরণ।

৭. ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদেরকে খাওয়ার স্যালাইন ও জিংক বড়ি (শিশুদের ক্ষেত্রে)-এর সাহায্যে চিকিৎসা করা, প্রয়োজনে রেফার করা, খাওয়ার স্যালাইন প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান।

৮. সদ্য বিবাহিত এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধীকরণ, সম্ভাব্য প্রসব-তারিখ সংরক্ষণ এবং তারিখ সমাগত হলে ... ... । ??????

৯. জন্ম মৃত্যু নিবন্ধীকরণ।

১০. কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

১১. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান।

১২. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কেন্দ্রে (UHFWC) কর্মতে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে আগ্রহী মহিলাদের আই.ইউ.ডি (IDU) স্থাপন, ১ম ডোজ গর্ভ নিরোধক ইজেনশন প্রদান এবং জন্মনিরোধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান। একইভাবে চিকিৎসা সহকারী (MA)/ উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিকিৎসা প্রদান।

১৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) এবং স্বাস্থ্য সহকারী (HA) কর্তৃক নির্ধারিত বিধি বিধান অনুযায়ী ২য় ও পরবর্তী ডোজ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদান।

১৪. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল রোগীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা।

১৫. শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক, শ্রবণ, অটিজম ও অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যা, দৃষ্টি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধিদের দ্রুত সনাক্ত করে কাউন্সেলিং ও রেফারেলের ব্যবস্থা করা।

১৬. সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা-পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া, হাঁপানী, চর্মরোগ এবং দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান বিশেষ করে ফসল তোলার সময় চোখে আঘাতজনিত সমস্যার (১৮ ঘন্টার মধ্যে) চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে রেফার।

১৭. ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (পরিবেশ স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি পান ও পয়ঃনিষ্কাশন), সুষম খাদ্যভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, শাল দুধসহ বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, এইচআইভি/ এইডস সহ অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও এর বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ধুমপান, তামাক, জর্দ্দা, সাদাপাতা, গুল বা অন্য কোন নেশা/মাদক জাতীয় সামগ্রী বিপনন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা। একই সাথে গর্ভকালীন ৫টি বিপদ চিহ্ন, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় যত্ন, নবজাতকের ৬টি বিপদ চিহ্ন এবং প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা।

১৮. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কনডম, খাবার বড়ি ইত্যাদির সাবক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ।

১৯. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী যারা কোন কারণে বর্তমানে খাবার বড়ি/কনডম ব্যবহার করছেন না কিংবা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসাধীন রোগী, যারা ঔষধ সেবনের জন্য আসছেন না বা ১ম/২য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ২য়/৩য় ডোজ টিকা নিতে ক্লিনিকে আসছেন না অথবা গর্ভবর্তী মহিলা যারা প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবাগ্রহণ করেন নি, তাদেরকে খুজে বের করে পুনরায় চিকিৎসা/সেবা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

২০. কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হবার পরও প্রয়োজনে বাড়ীতে গিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময় দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা।

২১. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাদি থাকা সাপেক্ষে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করা।

২২. পারিবারিক পর্যায়ে শয্যাশায়ী রোগীদের যারা সেবা দেন তাদের প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করা ব্যায়াম ও অন্যান্য আমোদ/প্রমোদের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

২. কমিউনিটি গ্রুপ

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অংশগ্রহণ ও বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত গ্রামসমূহের জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি কমিউনিটি গ্রুপ নামে অভিহিত হবে। কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের রুপরেখা নিম্নরুপঃ

২.১. কমিউনিটি গ্রুপ গঠন প্রক্রিয়া

সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের সহযোগিতায় সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।

২.২. কমিউনিটি গ্রুপ গঠনকল্পে নিম্নোক্ত পদ্ধতি/ধাপ অনুসরণ করা হবে ঃ

ধাপ-১: কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও মাঠকর্মীদের (স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী) সহায়তা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য ও তাদের দ্বায়িত্ব কর্ত্যব্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন ।

ধাপ-২: এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবা কাজে আগ্রহী স্ব-উদ্যোগী জনগণ, শিক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্যে ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং তাদেরকে কমিউনিটি গ্রুপ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন ।

ধাপ-৩: কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও মাঠকর্মীদের (স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী) সহযোগিতায় কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য হতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গের একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং সভায় যোগদানের জন্য আহবান জানাবেন ।

ধাপ-৪: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা/তাদের প্রতিনিধিসহ এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিটি ক্লিনিকের জন্য ১টি করে কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করা হবে ।

ধাপ-৫: কমিউনিটি গ্রুপ গঠন শেষে কমিউনিটি গ্রুপের সকল সদস্যের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন । কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের পর গ্রুপের সদস্য-সচিব তা ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদনপূর্বক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিষদে অবহিত করবেন ।

২.৩. কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য

২.৩.১ নিয়মিত সদস্য

প্রস্তাবিত কমিউনিটি গ্রুপ নিম্নেবর্ণিত ৯-১৩ জন নিয়মিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে (তন্মধ্যে কমপক্ষে ০৫ জন মহিলা থাকা আবশ্যক) । সদস্য মনোয়য়নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সদস্যগণ যেন কোন একটি বিশেষ অংশের বাসিন্দা না হন, বরং তারা যেন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী হতে পারেন । এই কমিটিতে এলাকার মহিলা, দরিদ্র/হতদরিদ্র, বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নিম্ন আয় সম্পন্ন জনগোষ্ঠী, কিশোরী/কিশোরদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে ।

১. কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যগণ (বর্তমান পরিষদের নির্বাচিত সদস্য) পদাধিকার বলে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন । সাধারণভাবে ০১ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ০১টি গ্রুপের সদস্য থাকবেন, তবে ঐ সদস্য সর্বোচ্চ ০২টি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য থাকতে পারবেন ।

২. জমিদাতা কিংবা তার ০১ জন প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন ।

৩. কমিউনিটি গ্রুপে ০১ জন মুক্তিযোদ্ধা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন ।

৪. শিক্ষক (উক্ত এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন অভিজ্ঞ ও সমাজসেবায় আগ্রহী শিক্ষক) বা স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি বা ধর্মীয় নেতা প্রতিনিধি হিসাবে ০২ জনকে গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ০১ জন হবেন মহিলা।

৫. এলাকার দরিদ্র/ভূমিহীন বা নিম্ন আয় সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে ২ জনকে গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে একজন মহিলা/কিশোরী/প্রতিবন্ধী হওয়া বাঞ্চনীয়।

৬. কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার ভোটদানের অধিকার ব্যতীত কমিউনিটি ক্রুপের সদস্য-সচিব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

৭. এলাকায় বসবাসরত ন্যূনতম ৪ জন মহিলা এই গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য যদি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত এলাকার বাসিন্দা হন তবে তিনি অবশ্যই পদাধিকার বলে এই সেবা দিতে পারবেন।

পাঠ - ০৭

সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে যোগযোগ (এসবিসিসি)

SBCC (Social Behavior Change Communication)

নং	আপ	মিডিয়া ও পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মি:
২	আচরণ, যোগাযোগ, আচরণের পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক ধারনা ও কার্য পরিধি।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২০ মি:
৩	**আচরণ বা অভ্যাস পরিবর্তনে যোগাযোগের ভূমিকা।** আচরণ পরিবর্তনে কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২০ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক।	১০ মি:

আচরণ :

মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহার বা অভ্যাসকে আচরণ বলা হয়। কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী ও নানান কাজের মধ্য দিয়ে আচরণ বা অভ্যাস প্রকাশ পায়। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার মাধ্যমে আচরণের প্রকারভেদ ঘটে। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের আচরণ বা অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বা পরিমন্ডলের উপরও ব্যক্তির আচরণ বা অভ্যাস নির্ভরশীল। ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন আচরন, এটাই মানুষের ধর্ম বা সর্বজনগ্রাহ্য। তাই বড় হয়ে উঠার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি মানুষকে জেনে নিতে হয় কোথায় কোন আচরণ বা ব্যবহার গ্রহণযোগ্য। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক মূলতঃ এই আচরণ বা অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল।

যোগাযোগ:
আমাদের জানা তথ্য, ধারনা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিকভাবে ও অর্থসহকারে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময় করতে পারার প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অন্যকে জানানোর বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত থাকে না বরঞ্চ অন্যের মতামত জানারও সুযোগ থাকে।

পরিবর্তন:
তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিক ও গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময়ের ফলে গ্রহীতার আচরণের বা অভ্যাসের যে, স্থায়ী বা অস্থায়ী লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাকে পরিবর্তন বলা হয়।

আচরণের পরিবর্তন:
কোন ব্যক্তিকে সফল যোগাযোগের মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে পৌছার জন্য ক্রম পর্যায়ের পরিবর্নের ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই পরিবর্তনের ধারার মধ্যবর্তী সময়কালকে 'ট্রানজিশনাল পিরিয়ড' বা মধ্যবতী সময় বলে। কৌশলগত যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগ তত্ত্বগত যে কাঠামোটি ব্যবহৃত হয় তাকে আচরণ পরিবর্তনের স্তর বা ধাপ বলা হয়। এই কাঠামোটি পাঁচটি স্থরে বিভক্ত।

আচরণ পরিবর্তনের ৫ টি ধাপ
আচরণ পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে গ্রহীতার অবস্থান নিম্নরুপ হতে পারে ঃ

১। জ্ঞান

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বা যে কোন বার্তা স্মরণ করা।
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয় বুঝতে পারা
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অথবা কোন সেবা সরবরাহের উৎস সম্পর্কে বলতে পারা।

২। অনুমোদন

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার পক্ষে সাড়া দেয়া
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয় সম্পর্কে বন্ধুবান্ধব অথবা পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা।
- বার্তার বিষয় সম্পর্কে পরিবার, বন্ধুবান্ধব অথবা কমিউনিটির অনুমোদন আছে কিনা তা চিন্তা করা
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয় অনুমোদন করা।

৩। ইচ্ছা

- চিন্তা করা যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা অথবা বার্তার বিষয়টি পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে
- বিষয়টি নিয়ে সেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করা
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করা বা সেবা গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখা।

৪। চর্চা

- তথ্য সরবরাহ ও সেবা গ্রহণের জন্য চাওয়া
- পদ্ধতি বা সেবা নির্ধারণ ও ব্যবহার শুরু করা
- পদ্ধতি ব্যবহার বা প্রাপ্ত সেবা চালিয়ে যাওয়া।

৫। এডভোকেসি/সহায়তা/সমর্থন দান

- অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা ও সেবাটির সুবিধা স্বীকার করা
- অন্যান্যদেরকে ব্যবহার করতে বলা
- কমিউনিটির সেবা কর্মসূচীতে সহয়তা করা।

ব্যাক্তি এবং দলের আচরণ, জ্ঞান স্তর থেকে কিভাবে এডভোকেসির স্থরে পৌছায়, আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগের ধাপের মাধ্যমে তা বোঝা যায়। মূলত: আচরণ পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক নিয়ম।

যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি পরির্বতন আনতে পারবেন তাহলে অবশ্যই তা পারবেন[১]।

মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা হচ্ছে যোগাযোগের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই আচরণ পরিবর্তনের আগে সাধারণত কতগুলি মাধ্যমিক স্থর অতিক্রম করতে হয়।

সময়ের ব্যবধানে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ধাপসমূহ পরিমার্জিত হয়েছে।

- সব মানুষ একইভাবে একই গতিতে অথবা একই সময়ে আচরণ বা অভ্যাসের পরিবর্তনের সব ধাপ অতিক্রম করতে পারেন না। যেমন, কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগেই পরিবার সীমিত রাখেন। অপরদিকে কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন, অনুমোদন করেন, কিন্তু অনেক পরে তারা অনুশীলন বা ব্যবহার করেন। আবার অনেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ হতে পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান লাভ করেন। এরা বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য পান বলে একটি আচরণ গ্রহণ করে তা অনুশীলন করেন এবং কখনো তা ব্যবহার করে নতুন আচরণ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।
- সফলভাবে কাজ চলছে বা বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন কর্মসূচীতে দেখা যায় জনগণের আচরণ পরিবর্তনের জন্য জ্ঞান অনুমোদন স্থরে থাকে। এ ধরণের অবস্থায় কর্মসূচীতে পরবর্তী স্তর যেমন ইচ্ছা, চর্চ্চা ও এডভোকেসির জন্য বেশী জোর দেয়া হয়। কর্মসূচীর এ অবস্থায় সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি, সেবা গ্রহণকারীর হার বাড়ানো, বাধা খুজে বের করা ও তা দূর করা ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেয়া হয়।
- সামাজিক নিয়মনীতি ব্যক্তির আচরণ বা অভ্যাস পরির্বনে প্রভাবিত করে। এর জন্য গণযোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ ও সামাজিক সমর্থন আদায় করতে হয়। রাজনৈতিক নেতা, নীতি নির্ধারক এবং স্থানীয় জনসাধারণ আচরণ বা অভ্যাস পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হতে পারেন।

[১] *সূত্র: এডভান্সেস ইন ফ্যামিলি হেলথ্ এন্ড সোশ্যাল কমিউনিকেশন ওয়ার্কশপ, বিসিসিপি।*

- জনগণের স্বীকৃতি, সন্তুষ্টি গ্রহণকারীদের দ্বারা প্রচারণা ও সহযোগীতার মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি হচ্ছে আচরণ বা অভ্যাস পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ। ব্যাহারকারীরা কোন সেবা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হলে তিনি ঐ সেবার পক্ষে কথা বলেন।

আচরণ বা অভ্যাস পরিবর্তনে যোগাযোগের ভূমিকা:

যোগাযোগের যে বিষয়গুলি মানব আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে সেগুলো

- সংশ্লিষ্ট বার্তা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে
- বন্ধুসুলভ ও খোলামনের পরিবেশে সৃষ্টি করে
- হাতে কলমে দেখিয়ে এবং প্রকৃত ঘটনার উদাহরণ দিয়ে
- সফলতা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করে
- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে

আচরণ পরিবর্তনে কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্র ৭টি

(১) Command Attention (মনোভাব আকর্ষণ)
কার্যকর যোগাযোগ এমন হতে হবে যাতে সহজেই অন্যান্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(২) Clarify the Message (পরিষ্কার তথ্য)
তথ্য হতে হবে সহজ ও স্পষ্ট; কারণ তথ্য চিন্তা করে বুঝতে হলে তা মনে রাখতে কষ্ট হয়।

(৩) Create Trust (বিশ্বাস তৈরী করে)
যোগাযোগের মাধ্যমে যদি গ্রহীতার বিশ্বাস তৈরী করা না যায় তবে গ্রহীতা সেবা গ্রহণ করবে না। তাই যোগাযোগ বা বার্তাকে অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে যাতে জনগণ তা বিশ্বাস করে আচরণ পরিবর্তনে আগ্রহী হয়।

(৪) Create to the Heart and Head (মনে ও চিন্তার দাগ কাটে)
কার্যকর যোগাযোগে মানুষের আবেগ ও মূল্যবোধকে মূল্য দেয়া উচিত-এতে সহজেই জনগণের মনে দাগ কাটে ও চিন্তার স্থান করে নেয়।

(৫) Communicate a Benefit (উপকার বা কি লাভ বোঝাবে)
অর্থাৎ যাদের জন্য বার্তাটি তৈরী করা হবে তারা যেন এ বার্তা অনুসরণ করে। তাদের আচরণ পরিবর্তনে কি লাভ তা যেন সহজে বুঝতে পারে।

(৬) Call for Action (কিছু করার জন্য আহবান করে)
যোগাযোগ ভাষার ধরণ এমন হওয়া উচিত যাতে জনগণকে সরাসরি কিছু করতে আহবান করা হয়।

(৭) Consistency (সামঞ্জস্যতা)
একটি বিষয় বার বার শুনে বা জেনে মানুষ শিক্ষালাভ করে। তাই কোন বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বা বিভন্ন সময় যোগাযোগ করা হলে তার মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হবে। এতে জনগণ সহকেই বিষয়টি বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।
কার্যকর যোগাযোগের ৭টির মাধ্যমে প্রতিটি ধাপে আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

আজকের আধুনিক পৃথিবীতে সফল যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৪টি আর (4R) গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে যে, একটি যোগাযোগ সফল হয় 4 Right এর মাধ্যমে	
Right -	সঠিক তথ্য দেয়ার মাধ্যমে (Giving Right Message)
Right -	সঠিক ব্যক্তিকে (to Right Person)
Right -	সঠিক মাধ্যমের সাহায্যে (through Right Channel)
Right -	সঠিক সময়ে (At Right time)

অর্থাৎ সঠিক ব্যক্তিকে, সঠিক সময়ে, সঠিক মাধ্যমে ব্যবহার করে, সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে।
আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সফল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে 4R বা 4 Right এর কথাও মনে রাখতে হবে। ৭টি C র সাথে সাথে 4R-এর সমন্বয় গ্রহীতা বা জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

উপযুক্ত বার্তা প্রদান

- চাহিদা নির্ণয় : গ্রহীতার প্রয়োজন উপযোগী বার্তা নির্বাচনের জন্য তার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাহিদা নির্ণয় করা প্রয়োজন ।
- পুনরালোচনা : স্বাস্থ্য বিষয়ক নতুন অভ্যাস তৈরীর লক্ষ্যে সেই বিষয়ে গ্রহীতার বর্তমান অবস্থা জানার প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপ ভেদে বার্তা পরিবর্তন ।
- উপযুক্ত বার্তা নির্বাচন : গ্রহীতার গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায় অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্তা নির্বাচন করা । এছাড়াও বার্তা নির্বাচনের সময় গ্রহীতার সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, অভ্যাস, অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে; যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহার করে গ্রহীতার সঙ্গে দ্বি-মুখী যোগাযোগ করা (স্বাস্থ্য শিক্ষার চেকলিষ্ট ব্যবহার করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে) ।

পাঠ-০৮

সহায়ক সুপারভিশন ঃ ধারণা ও গুরুত্ব

(Supportive Supervision)

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২	সহায়ক সুপারভিশনের সজ্ঞা, এর মূল বিষয়সমূহ, সুপারভিশন ও সহায়ক সুপারভিশনের মধ্যে পার্থক্য	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা	১৫ মিঃ
৩	সহায়ক সুপারভিশনের প্রকার ভেদ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ।	উপস্থাপনা, কেস স্টাডি ও আলোচনা	২৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

১। ভূমিকা (Introduction)

সহায়ক সুপারভিশন সেবা প্রদানকারী সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেখানে কাজের কার্যকারিতা কর্মীর কাজ সম্পাদনের গুনাগুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে । সংগঠনের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে একজন ব্যবস্থাপক যখন তার অধীনস্ত কর্মীদের কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নিয়মিতভাবে তাদের কাজ সরেজমিনে ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ মানসম্মত কার্যক্রম করার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনে হাতে কলমে সহায়তা করেন, তখন ব্যবস্থাপক কর্মকর্তার এই কার্যক্রমকে সহায়ক সুপারভিশন বলা হয়। কোন কোন সংগঠনে সুপারভাইজারের আলাদা পদ থাকে । তিনিই সুপারভিশনের কাজটি করে থাকেন ।

২। সংজ্ঞা (Definition)

সঠিকভাবে ও নির্ধারিত মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রযোজনীয় সহায়তা প্রদান করার প্রক্রিয়াকে সহায়ক সুপারভিশন বলা হয় ।

এই পদ্ধতিতে সুপারভাইজারগণ শুধুমাত্র কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেই সহায়তা করে না বরং কর্মীদের কর্মস্থলের সুযোগ সুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন ।

অন্যভাবে বলা যায়, সহায়ক সুপারভিশন হলো আন্তঃব্যাক্তিক যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া যেক্ষেত্রে সুপারভাইজার এবং কর্মচারী উভয়ের সময়, সতর্কতা, মনোযোগ এবং ধৈর্য প্রয়োজন হয় । এক্ষেত্রে সুপারভাইজার অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং প্রয়োজন মত আলোচনা, প্রশ্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসরণ, ব্যাখ্যা, উৎসাহ প্রদান করবেন এবং শিখিয়ে দিবেন । প্রয়োজনে প্রদর্শনের (Demonstration) মাধ্যমে দক্ষতা বাড়াবেন ।

তাই সহায়ক সুপারভিশন হলো কর্মীকে তার কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান করা যাতে করে তিনি তার প্রতিষ্ঠান/বিভাগ এর কাজের গুণগত মান বজায় রেখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হন ।

একজন দক্ষ/নিপুন সুপারভাইজার জিজ্ঞাসিত না হলে কখনো বলেন না কি করে কাজগুলি কর্মীদের করতে হবে । তিনি বরং কর্মীদেরকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে থাকেন । একজন আদর্শ সুপারভাইজার তার কর্মীদের বলেন "আপনারা বলুন, আমি কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি"? অথবা "আপনারা কিভাবে কাজটি সুসম্পন্ন করতে চান তা আমাকে জানান" ।

৩। সহায়ক সুপারভিশনের মূল বিষয়সমূহ :-

- কর্মীর সম্পাদিত কাজটি প্রত্যাশিত মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হয়েছে কিনা দেখা
- কর্মীদের নিয়মিতভাবে সরেজমিনে ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- সম্পাদিত কাজের গুণগতমান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ফিডব্যাক প্রদান
- কর্মীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে হাতে কলমে সহায়তা করা
- কর্মস্থলের পরিবেশ ও উপকরণ উন্নয়নে সহায়তা করা এবং
- কর্মীকে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করা ।

৪। প্রচলিত সুপারভিশন ও সহায়ক সুপারভিশনের মধ্যেকার পার্থক্য :-

প্রচলিত সুপারভিশন	সহায়ক সুপারভিশন
(১) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে সুপারভিশন করা হয় ।	(১) কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জনের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুপারভিশন করা হয় ।
(২) চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয় না ।	(২) চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়
(৩) সমস্যা চিহ্নিত করা হলেও সমাধান করার পরিকল্পনা থাকে না ।	(৩) কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়ন করা হয় ।
(৪) সমস্যার সমাধান হলো কিনা তার ফলোআপ করা হয় না ।	(৪) নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ভিজিটে চিহ্নিত সমস্যা দুর করার উদ্যোগ নেয়া হয় ।
(৫) কর্মসম্পাদনের প্রত্যাশিত মান কর্মীকে জানানো হয় না ।	(৫) কর্মীর কাজের প্রত্যাশিত মান কর্মীকে নিয়মিত জানানো হয় ।
(৬) কর্মীকে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা দুর্বল ।	(৬) কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় ।
(৭) কর্মীর কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নয়নে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না ।	(৭) কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয় ।

৫। সহায়ক সুপারভিশনের প্রকার (Types of Supportive Supervision)

সহায়ক সুপারভিশন প্রধানত ঃ দুই প্রকার -

(১) সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সুপারভিশন (Direct Supervision)

(২) পরোক্ষ সুপারভিশন (Indirect Supervision)

(১) প্রত্যক্ষ সুপারভিশনঃ

প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সুপারভিশন কর্মীর উপস্থিতিতে তার কাজের সময়ে করা হয়ে থাকে ।

প্রত্যক্ষ সুপারভিশনের সময় যা করা হয় -

- সেবা প্রদান স্থানে বা কেন্দ্রে কর্মীকে কর্মরত অবস্থায় সরাসরি সুপারভাইজ করা ।
- সেবা প্রদান স্থানে বা কেন্দ্রে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট রিভিউ করা ।
- সেবা প্রদান স্থানে বা কেন্দ্রে কর্মীর সাথে সরাসরি কথা বলা ।
- কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহণকারীদের কাছে থেকে ফিডব্যাক নেওয়া ।
- স্বাস্থ্য সেবার স্থানে বা কেন্দ্রের মালামাল সরেজমিনে পরীক্ষা করা ।
- স্বাস্থ্য সেবার স্থানে বা কেন্দ্রে চেকলিষ্ট পূরণ করা ।

(২) পরোক্ষ সুপারভিশনঃ

পরোক্ষ সুপারভিশন কর্মীর অনুপস্থিতে ডকুমেন্ট হতে বা অন্যান্য কর্মীকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে ।

পরোক্ষ সুপারভিশনের সময় যা করা হয় -

- স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সেবাগ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করা ।
- Performance প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা ।
- কর্মীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা ।
- সরাসরি সুপারভাইজারদের সাথে আলোচনা করা ।
- সরাসরি সুপারভাইজারদের প্রতিবেদন রিভিউ করা ।
- গুচ্ছ সার্ভে/যে কোন ধরণের সার্ভে করা ।
- অতীত কর্মের নিরীক্ষা ও ধারণা নেয়া ।

৬। সহায়ক সুপারভিশনের গুরুত্ব ঃ

(ক) সেবা প্রদানকারীর কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে -

- কর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- কর্মীর পারফরমেন্স নিয়মিত পরিবীক্ষণ হবে।
- নিয়মিত কর্মীর কর্মস্থলে সুপারভাইজারের সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।

(খ) কর্মীর কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নত হবে -

- কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় রেজিস্টার, ফর্ম, সাপ্লাইজ নিশ্চিত হবে।
- কর্মী ও সুপারভাইজারের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে।
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।

(গ) সেবা গ্রহীতাগণ মানসম্মত সেবা পাবেন -

- সেবা গ্রহীতাগণ ভালো পরিবেশে সেবা পাবেন।
- স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা পাবেন।
- গরীব মহিলা ও শিশুরা বেশী স্বাস্থ্য সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঘ) সেবা প্রদানকারীর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হবে।

(ঙ) সুপারভাইজার ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হবে।

৭। সহায়ক সুপারভিশনের বৈশিষ্ট্য ঃ

- পর্যাপ্ত সময় নিয়ে নিবিড়ভাবে সুপারভিশন করা,
- সুপারভিশন নিয়মিত করা,
- কর্মীর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা,
- যথা সম্ভব চেকলিস্ট ব্যবহার করা,
- পর্যবেক্ষণ নোট তাৎক্ষনিকভাবে লিপিবদ্ধ করা,
- সুপাভিশনের প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করা,
- পরবর্তী সুপারভিশনকালে প্রদত্ত সুপারিশ সমূহের উপর গৃহীত পদক্ষেপের ফলোআপ করা।

৮। সহায়ক সুপারভিশনের উপর একটি কেইস ঃ

পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ - সহায়ক সুপারভিশন সফলভাবে করার বাস্তব উদাহরণ দিতে পারবেন।
বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ঃ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এই কেইসটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলুন। তারপর তাদের নিকট থেকে মতামত গ্রহণ করুন।

অথবা, প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৪/৫ দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দল তাদের দলনেতা ঠিক করবেন। তারপর তারা দলগতভাবে কেইসটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং দলনেতা বিষয়ের উপর মতামত দিবেন।

সহায়ক সুপারভিশনের উপর কেইস

একদিন সুপারভাইজার একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ভিজিটে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন পরিবার কল্যাণ সহকারী একজন কৃষকের পায়ের কাটা জায়গায় ব্যান্ডেজ করছেন। পরিবার কল্যান সহকারী ব্যান্ডেজে করনীয় সবকিছুই করলেন। তবে কাটা জায়গাটি স্যাভলন/ডেটল/স্পিরিট দিয়ে যথারীতি পরিষ্কার করলেন না।

সেবাগ্রহীতার উপস্থিতিতে সুপারভাইজার সেবাপ্রদানকারীর কাজের প্রশংসা করলেন এবং সেবাপ্রদানের নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য পুনঃ প্রশংসা করলেন। তবে যথাযথভাবে কাটা জায়গা পরিষ্কার না করার কথা সেবাপ্রদানকারীকে কিছুই বললেন না। তার পরিবর্তে সুপারভাইজার বললেন, আপনি ভালো সেবা প্রদান করেছেন কিন্তু এভাবে পরিষ্কার করে যদি ক্ষত স্থানের ব্যান্ডেজটি বাধা হয় তাহলে সংক্রমন প্রতিরোধ নিশ্চিতসহ আরো ভালো সেবা প্রদান করা যায়। এই বলে তিনি সেবা গ্রহীতার ক্ষত স্থানের ব্যান্ডেজটি খুলে ডেটল/স্যাভলন/স্পিরিট দিয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজটি পুনরায় করে দেখালেন। তারপর সেবাপ্রদানকারীকে সুপারভাইজার অনুরোধ করলেন তাকে বলার জন্য কিভাবে পুনরায় ব্যান্ডেজটি যথাযথভাবে করা

হল। কর্মী সঠিকভাবে উত্তর দিলে পুনরায় তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন এবং একইভাবে এরূপ ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহ দিলেন।

সুপারভাইজার সেবাপ্রদানকারীকে বললেন, যদি কোন সময় ডেটল/স্যাভলন/স্পিরিট না থাকে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

লক্ষ্যনীয়

- ❖ প্রশংসা করলেন।
- ❖ ভুলের জন্য নিরুৎসাহিত করলেন না।
- ❖ হাতে কলমে ব্যান্ডেজ করে দেখালেন।
- ❖ ডেটল/স্যাভলন/স্পিরিটের সাপ্লাইয়ের জন্য পদক্ষেপ নিলেন।

পাঠ-০৯
মনিটরিং চেকলিষ্ট

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ।	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মি:
২	চেকলিষ্ট-এর সংজ্ঞা, চেকলিষ্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্য ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	১৫ মি:
৩	বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের উদাহরণ ও বর্ণনা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	২৫ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

সংজ্ঞা ঃ
চেকলিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের দক্ষতা ও গুনগত মান যাচাই এর একটি হাতিয়ার । চেকলিষ্ট এর মাধ্যমে একটি বড় কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা এবং সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় । এতে কোন কাজের পর কোন্ কাজ করতে হবে বা একটি পরিপূর্ণ কাজের জন্য কোন কোন কাজ করা দরকার তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে । একজন পর্যবেক্ষক যখন কোন কর্মীর কাজ পরিপূর্ণ করেন তখন তিনি সেই কাজ পর্যবেক্ষণের একটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করতে পারেন যা পূর্বেই প্রস্তুত করা থাকে । চেকলিষ্ট ব্যবহারে কর্মীর কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা এবং তিনি তা যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেন কিনা পর্যবেক্ষক তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন । এতে কর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতার কোথায় বা কোন বিশেষ অংশে ঘাটতি রয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারেন ।

মনিটরিং চেকলিষ্ট

চেকলিষ্ট:
চেকলিষ্ট (checklist) প্রকৃত পক্ষে একটি ইংরেজী শব্দরূপ যার মর্মার্থ হলো, কোন আভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব কাজ বা দায়িত্ব সম্পাদন করা প্রয়োজন সেগুলির পূর্ব-প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা । সার্বিক অর্থে, উদ্দিষ্ট কাজসমূহ বাস্তবায়নের সময় কাজের যে তালিকাটি অনুসরণপূর্বক অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাকে সংক্ষেপে চেকলিষ্ট বা "নজর তালিকা" বলা হয় ।

চেকলিষ্টের সময় অবশ্যই কাজের ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে । অর্থাৎ আগের কাজ আগে এবং পরের কাজ পরে সাজিয়ে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে । অনেক সময় চেকলিষ্টকে কর্ম পরিকল্পনার বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে । তবে প্রকৃত অর্থে কোন কর্ম পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যাকে ইংরেজীতে Checklist বলা হয় ।

চেকলিষ্ট প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক সময়ে কাজটি সম্পাদন করা আমরা জানি, উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজের ধরন এবং প্রক্রিয়ার রকমফের হয়ে থাকে । তদনুযায়ী চেকলিষ্টের উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিভিন্নরকম কাঠামো বা অবয়ব প্রচলিত । সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য চেকলিষ্টের একক কোন ছক বা কাঠামো নেই । তবে, এর মূল তিনটি উপাদান যথা-

১. কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ধারাবাহিকতা
২. ভূমিকা/কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং
৩. কাজ সম্পদনের সংক্ষিপ্ত/সময়-ছকে অন্তর্ভূক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় । প্রত্যেক বৈশিষ্টের কাজের জন্যে আলাদা আলাদা চেকলিষ্ট প্রণয়ন/অনুসরণ অধিক কার্যকর । চেকলিষ্ট অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো । যথাযথভাবে প্রণয়ণকৃত/অনুসরণকৃত চেকলিষ্ট যা
    - কাজ বাস্তবায়ন সহজ করে আনে,
    - সময়সহ অন্যান্য সম্পদ অপচয় রোধ করে,
    - বস্তবায়ণকারীর দক্ষতা ও কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সর্বপরি
    - অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করে ।

একটি সুপারভিশন চেকলিষ্টের উদাহরণ

বিষয় ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানরত একজন কর্মীকে তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে

ক্রমিক নং	যেসব বিষয় দেখতে হবে	মন্তব্য	
		হ্যাঁ	না
১.	সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন?		
২.	স্বাস্থ্য শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বিষয় সম্পর্কে বলেছেন?		
৩.	এ বিষয়ে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে বলেছেন?		
৪.	সঠিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন?		
৫.	উপকরণ কি সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন কি না?		
৬.	খুব তাড়াহুড়া করা হয়েছে?		
৭.	বিষয় অনুযায়ী বক্তব্য সঠিক ছিল?		
৮.	সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?		
৯.	শ্রোতাকে কি কথা বলার বা প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে?		
১০.	ক্লায়েন্টের বক্তব্য ভালভাবে শুনেছেন কি না?		
১১.	শ্রোতার বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে কি শ্রদ্ধা করা হয়েছে?		
১২.	শ্রোতাকে তিরস্কার করা হয়েছে?		
১৩.	শ্রোতার সমস্যার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং সমাধান দিয়েছেন?		
১৪.	শ্রোতা কতটুকু বুঝলো তা কি যাচাই করেছেন?		
১৫.	বক্তব্য বিষয় কাজে লাগাতে অনুরোধ করেছেন?		
১৬.	সকলকে / শ্রোতাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন?		

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট (পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের জন্য)

ক্রমিক নং	যে সব বিষয় দেখতে হবে	মন্তব্য	
		হ্যাঁ	না
০১.	শুভেচ্ছা/কুশল বিনিময় করেছেন?		
০২.	আলোচনা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন?		
০৩.	কর্মীর (পরিবার কল্যাণ সহকারী) কাজ সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন?		
০৪.	সহযোগী মনোভাব প্রদর্শন করেছেন?		
০৫.	সহায়ক সুপার ভাইজার হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন?		
০৬.	কর্মীর ভুল ত্রুটি/গ্যাপ তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ক্লায়েন্টকে পরামর্শ দিয়ে কর্মীকে সহায়তা করেছেন ।		
০৭.	পরবর্তীতে কর্মীকে (ক্লায়েন্টের অনুপস্থিতিতে) তার ভুল ত্রুটি/গ্যাপ সমূহ তুলে ধরে কর্মীর করণীয় বিষয় বলে দিয়েছেন?		
০৮.	ক্লায়েন্টের সংগে আলোচনায় দ্বিমুখী যোগাযোগ নিশ্চিত করেছেন?		
০৯.	সকল ক্লায়েন্টের দিকে সমান মনোযোগ দিয়েছেন?		
১০.	ক্লায়েন্টের বক্তব্য/প্রশ্নকে উৎসাহিত করেছেন এবং ধৈর্য্য সহকারে শুনছেন ও উত্তর দিয়েছেন?		
১১.	কাউন্সিলিং এর ধাপ সমূহ অনুসরণ করে পরামর্শ দিয়েছেন?		
১২.	ফিডব্যাক নিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ পূনরায় বলে দিয়েছেন?		
১৩.	মূল বক্তব্য/বিষয় সারমর্ম করে বলেছেন?		
১৪.	ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়েছেন?		

পর্যবেক্ষণকারী ঃ
তারিখ ঃ

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এফ,পি,আই এর ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করুন এবং ডান দিকের 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কলামে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক্রমিক নং	যে সব বিষয় দেখতে হবে	মন্তব্য	
		হ্যাঁ	না
০১.	এফ,পি,আই কি এফ, ডাব্লিউ,এ- এর কুশল জিজ্ঞেস করেছেন?		
০২.	তিনি কি এফ,ডাব্লিউ-এর কাজকে খুব মনযোগ দিয়ে দেখেছেন?		
০৩.	ক্লায়েন্টের সামনে কর্মীকে কি অপমান সূচক কথা বলেছেন?		
০৪.	তিনি কি এফ, ডাব্লিউ-এর কাজ কে নিজে করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন?		
০৫.	এফ, ডাব্লিউ, এ- এর বক্তব্য কি ধৈর্য্য সহকারে শুনেছেন?		
০৬.	তিনি এফ, ডাব্লিউ, এ-এর প্রকৃত দুর্বলতা নির্ধারণ করতে পেরেছেন?		
০৭.	তিনি কি ভদ্রভাবে সঠিক ফিডব্যাক দিয়েছেন?		
০৮.	এফ, ডাব্লিউ, এ প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে এনেছেন কি না তা কি খোজ করেছেন?		

অন্য কোন মন্তব্য যদি থাকে ঃ .....
.....

পাঠ ঃ ১০

শিষ্টাচার

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মিঃ
২	শিষ্টাচারের সংজ্ঞা, কর্মক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও অনুসরণীয় বিষয়সমূহ	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	১৫ মিঃ
৩	নিয়মিত চলাচলে এবং বিভিন্নস্থানে, বিভিন্নজনের সাথে আচরন ও পোশাক - পরিচ্ছদে ও টেলিফোনে শিষ্টাচার ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	২৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

শিষ্টাচার মানে ভদ্রতা বা সৌজন্যবোধ; শিষ্টাচার হলো মানুষের অন্যতম মানবীয় গুণ । ভদ্রতা-নম্রতা ও আদব-কায়দাকে এক কথায় শিষ্টাচার বলে । শিষ্টাচার সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় । অফিস বা ব্যক্তি জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ।

কর্মক্ষেত্রে/চাকুরিতে শিষ্টাচার ঃ একজন সাধারণ নাগরিক কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ হতে একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যাতে পৃথক এবং সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা যায় সে কারণে সরকারি চাকুরিজীবিদের চাকুরিতে সৌজন্যবোধ জানা প্রয়োজন । একজন সরকারি চাকুরিজীবি অন্যের প্রতি বিনয়ী ও বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার করবেন, এটাই প্রত্যাশা করা হয় । একজন সরকারি চাকুরিজীবি সবসময় জনসেবায় নিয়োজিত, তিনি সরকারের বিশ্বাসভাজন হবেন, ন্যায় ও সততার সাথে কর্তব্য পালন করবেন, সর্বদা প্রফুল্ল থাকবেন এবং হাসিমুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্য পালন করবেন ।

কর্মক্ষেত্রে শিষ্টাচার পালনে অনুসরণীয় কতিপয় বিষয় ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারী/কর্মীর সাফল্য নির্ভর করে তার আচরণ ও তার কাজে । তাই শিষ্টাচার একটি আবশ্যকীয় গুণ ।

- কোন বিষয় সম্পর্কে অনুরোধ জানানো/সম্মতি বা অসম্মতি জানানোর প্রকাশ ভঙ্গিতে মার্জিত ভাব থাকা, অভিব্যক্তি সবসময় ভালভাবে পেশ করা,
- চাকুরিতে প্রবেশের পরপরই নিজ দায়িত্ব কর্তব্য, অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা,
- সময় জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকা । নিজের পেশার প্রতি আস্থা রাখা, অর্পিত দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী ও নিবেদিত থাকা,
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সম্মান প্রদর্শন, আনুগত্য এবং কর্মক্ষেত্রে সকলকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করতে দেবার চেষ্টা করা,
- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট আগত ব্যক্তিকে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং প্রয়োজনে বসতে বলা,
- কর্মস্থলে যোগদান করার পর অন্যান্য সহকর্মীর সাথে সাক্ষাৎ, সেখানকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা,
- সহকর্মীদের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হওয়া । সহকারী বা কারো সাথে দ্বি-মত হলে তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা,
- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বে-আইনি আদেশ দিলে বা কাজ করতে বললে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও দৃঢ়তা দিয়ে সে কাজ থেকে বিরত থাকা এবং বিনয়ের সাথে অপারগতা জানানো ।

মহিলা সহকর্মী ও অন্যান্য মহিলাদের সাথে শিষ্টাচার ঃ

- সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের সম্মান করা । মহিলা সহকর্মীদের কাজে সহযোগিতা করা ।
- মহিলা সহকর্মীর প্রতি এমন কোন আচরণ না করা, যার প্রেক্ষিতে তিনি অস্বস্তিকর বা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন ।
- কোন অধূমপায়ী বা মহিলার সামনে ধূমপান করতে হলে অনুমতি নেয়া ।
- অফিসে মহিলা আগন্তুক আসলে সম্মানের সাথে বসতে দেয়া এবং দাঁড়িয়ে সম্মান করা ।
- বাসে, ট্রেনে ও গাড়িতে মহিলাদেরকে আসন ছেড়ে বসতে দেয়া ।

বয়স্ক (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা)দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঃ

সকল ক্ষেত্রে বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহানুভূতির সাথে সহযোগিতা করা এবং সংবেদনশীল আচরণ করা আবশ্যক। অফিসে বয়স্ক আগন্তুক আসলে সম্মানের সাথে বসতে দিতে হবে এবং দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হবে।

সিঁড়ি ও লিফ্ট দিয়ে ওঠা নামার সময় শিষ্টাচার ঃ

- সিঁড়ি ও লিফ্ট দিয়ে নিঃশব্দে ওঠানামা করা ও আলাপচারিতা বা জটলা করে অন্যের চলাচলে বিঘ্ন না ঘটানো। সিঁড়িতে পানের পিক; কাশি ও থুথু ফেলে নোংরা না করা।
- সিঁড়ি ও লিফ্ট এ নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অসদাচারণ থেকে বিরত থাকা।

টেলিফোন আচরণ ঃ কথা বলা একটি আর্ট এবং টেলিফোনে কথা বলার সময় স্পষ্ট ও বিনয়ী হওয়া দরকার। টেলিফোন রিসিভের সময় সালাম/ সৌজন্যমুলক কথা বলা এবং নিজের পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকলে ম্যাসেজ ভালভাবে বুঝে লিখে রাখা এবং কর্মকর্তা উপস্থিত হলে তা অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে সালাম দিয়ে শেষ করা আবশ্যক। অফিসের ফোন অপ্রয়োজনীয় আলাপ-চারিতায় ব্যস্ত না রাখা , আলাপ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে। অফিসে সম্ভব হলে মোবাইল ফোন সাইলেন্স মোডে রাখতে হবে। বস্ বা জেষ্ঠ্যদের সামনে টেলিফোনে ব্যক্তিগত কথা বলা চূড়ান্ত অভদ্রতা।

পোশাক পরিচ্ছদে শিষ্টাচার ঃ একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী মার্জিত বা রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা হচ্ছে ঐতিহ্যগত। সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদের পেশাগত এবং বাণিজ্যিক মূল্য ছাড়াও যথেষ্ট সামাজিক মূল্য রয়েছে।এটি একজন কর্মীর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। পোশাকের যত্ন ও সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে।

পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ পদ্ধতি ঃ (ইউনিফরমধারী কর্মচারী হলে ইউনিফরম পরিধান বাধ্যতামূলক)

- শার্ট ঃ

শার্টের রং নির্বাচনে মূল দিক হচ্ছে মার্জিত অথচ সুন্দর সাদা রং ই হচ্ছে সবচেয়ে মানানসই। যদি রঙ্গিন পরতে চান তবে হালকা রং পছন্দ করা উচিত। স্টাইপ শার্ট ব্যবহার করা যায়। তবে বড় চেক শার্ট ও কড়া রঙের প্রিন্টের শার্ট বর্জনীয়। শার্ট কেনা বা বানানোর সময় গলার মাপ এর সাথে হুবহু মিলিয়ে কেনা গুরুত্বপূর্ণ। রেগুলার ফিট শার্ট পরিধান করা উচিত।

- প্যান্ট ঃ

প্যান্ট এর কাটিং স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয় (বেশি ঢোলা বা বেশি সরু নয়) জিনস্ প্যান্ট পরে অফিস করা উচিত নয়। একমাত্র ড্রেস প্যান্ট (যাকে এক্সিকিউটিভ ড্রেস বলা হয়) অফিস উপযোগী।

- জুতা ঃ

জুতা পায়ের সংগে সুন্দরভাবে খাপ খেতে হবে। জুতার ফিতা থাকলে তা ঠিকমত বাঁধতে হবে। জুতা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। জুতার উপরিভাগ সেলাই করে পরা বর্জনীয়। জুতার রং মূলতঃ কালো, বাদামী রং হলেও চলে। স্লিপার ধরনের স্যান্ডেল ব্যবহার বর্জনীয়। স্যান্ডেল-সু পরা যেতে পারে। কারুকাজ করা স্যান্ডেল পরিত্যাজ্য। মহিলারা অফিসে হাইহিল ব্যবহার করবেন না। যে জুতা পরে হাঁটলে অনেক শব্দ হয়, তা বর্জন করা উচিৎ।

- মোজা ঃ

অফিসিয়াল মোজা Calf high হতে হবে। পরিধেয় ক'এক জোড়া মোজা থাকা ভাল। মোজা থেকে যেন কোন দুর্গন্ধ বের না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। মোজা অতি নিয়মিত ধুতে হবে।

- দাপ্তরিক আপ্যায়ন ঃ

পানি পরিবেশনকালে গ্লাসের বাইরে যাতে পানি বা পানির বিন্দু লেগে না থাকে। সম্ভব হলে পিরিচের উপর গ্লাস দিয়ে পানি দিতে হবে এবং গ্লাসের উপর পিরিচ দিয়ে ঢাকা থাকতে হবে অথবা গ্লাস ঢাকার সসার (ঢাকনা) ব্যবহার করতে হবে। পিরিচে যেন পানির অবশিষ্টাংশ না থাকে। গ্লাস যেন স্বচ্ছ হয়। চায়ের কাপের বাইরের অংশে এবং পিরিচে কোন ভাবেই যেন চায়ের বিন্দু বা চা লেগে না থাকে। চা ও চিনি আলাদা দেয়া উত্তম। কাপে চুমুক দিয়ে চা পান করা নিয়ম; পিরিচে ঢেলে নয়। টেবিল টিস্যু ও ফেসিয়াল টিস্যু এক জিনিস নয়।

- প্রসাধনী ঃ

কোন কড়া সুগন্ধী ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে মহিলাগণ জবরজং অলংকার ব্যবহার করবেন না।

পাঠ ঃ ১১
ছুটির বিধি-বিধান

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ।	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মিঃ
২	সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি ।	পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	১০ মিঃ
৩	ছুটির প্রকার ভেদ ও এর বিস্তারিত বর্ণনা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	৩০ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্রামের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার যে সুবিধা দিয়ে থাকেন তাকে ছুটি বলে । উল্লেখ্য যে, কোন ছুটিই অধিকার নয় । এটি একটি সুবিধা মাত্র ।

ছুটি সম্পর্কীয় নিয়মাবলী প্রেস্‌ক্রাইব্‌ড লিভ রুলস, ১৯৫৯ এবং "এফআর" ও "বিএসআর" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । উক্ত বিধিমালাসমূহে নিম্নোক্ত প্রকার ছুটির বিধান রয়েছে ।

১ । অর্জিত ছুটি ।
২ । অসাধারণ ছুটি ।
৩ । অক্ষমতাজনিত ছুটি ।
৪ । অধ্যয়ন ছুটি ।
৫ । সঙ্গনিরোধ ছুটি ।
৬ । প্রসূতি ছুটি ।
৭ । চিকিৎসালয় ছুটি ।
৮ । বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি ।
৯ । অবকাশ বিভাগের ছুটি ।
১০ । বিভাগীয় ছুটি ।
১১ । প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ।
১২ । অবসর উত্তর ছুটি ।
১৩ । বাধ্যতামুলক ছুটি ।
১৪ । বিনা বেতনে ছুটি ।
১৫ । নৈমিত্তিক ছুটি ।
১৬ । সাধারণ ও সরকারী ছুটি
  ক) সাধারণ ছুটি,
  খ) নির্বাহী আদেশে ছুটি,
  গ) ঐচ্ছিক ছুটি,
১৭ । শ্রান্তি বিনোদন ছুটি,
১৮ । বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ।

১। অর্জিত ছুটি :

কর্মকালীন যে ছুটি অর্জিত হয়, তা অর্জিত ছুটি । অর্জিত ছুটি ২ (দুই) প্রকার- ক) গড় বেতনে ছুটি খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি-

ক. কর্মকালীন সময়ের এগার ভাগের এক ভাগ হারে গড় বেতনে ছুটি অর্জিত হয় এবং সর্বাধিক চার মাস পর্যন্ত জমা থাকবে । অতিরিক্ত অর্জিত ছুটি পৃথক আইটেমে জমা হয় ।

খ. গড় বেতনে ছুটি এককালীন চার মাসের বেশী ভোগ করা যায় না ।

গ. কর্মকালীন সময়ের বার ভাগের এক ভাগ হারে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জিত হয় এবং সীমাহীনভাবে জমা হয় প্রতি দুই দিনের অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে এক দিনের গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যায় ।

২। অসাধারণ ছুটি :

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি প্রদেয় :

ক. যখন বিধিমতে অন্য কোন ছুটি প্রাপ্য নয়, অথবা

খ. যখন অন্য কোন প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির আবেদন করেন।

এ ধরনের ছুটির ক্ষেত্রে বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন না এবং ছুটির হিসাব হতে বাদ যাবে না।

৩। অক্ষমতাজনিত ছুটি :

একজন সরকারী কর্মচারী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অথবা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বপালনকালে আহত হয়ে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তাঁকে অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রদান করা যায়। দুর্ঘটনার তিন মাসের মধ্যে এ অক্ষমতা দেখা দিতে হবে। মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে ছুটি বর্ধিত করা হয়। অন্য যে কোন প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে এ ছুটি প্রদান করা যাবে।

৪। অধ্যয়ন ছুটি :

সরকরের সাধারণ আদেশের শর্তাধীনে একজন সরকারী কর্মচারীকে সায়েন্টিফিক, টেকনিক্যাল অথবা তদরূপ শিক্ষার জন্য অথবা নির্দেশনাগত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য অধ্যয়ন ছুটি প্রদান করা যায়। এ ধরনের ছুটি হিসাব হতে বিয়োগ করা হয় না।

ক. এ প্রকার ছুটি একমাত্র সরকার মঞ্জুর করতে পারে।

খ. সাধারণত চাকুরির মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ না হলে এ ধরনের ছুটি প্রদান করা যায় না এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পূর্ববতী তিন বছরের মধ্যে এ প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। সাধারনত: এককালীন ১২ মাস পর্যন্ত এ প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে আরো ১২ মাস পর্যন্ত এ প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়। তবে কোন ক্রমেই চাকুরি জীবনে ২ বছরের বেশী হবে না। অসাধারন ছুটি মিলিয়ে (২৪+৪+৩২)=৬০ মাস সর্বোচ্চ ছুটি প্রদান করা যায়।

গ. পদোন্নতি ও পেনশনের ক্ষেত্রে চাকুরী কাল গণনার ক্ষেত্রে এ প্রকার ছুটি কর্মকালীন হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ. অধ্যয়ন ছুটিকালীন সময়ে অর্ধগড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য হবে।

৫। সংগনিরোধ ছুটি :

সরকারী কর্মচারী নিজে ব্যতীত তাঁর পরিবারের কোন একজন বা সকল সদস্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে এবং উক্ত রোগ কর্মচারীর মাধ্যমে অফিসে বিস্তার লাভের সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারি সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ২১ দিন পর্যন্ত এ প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে এ ছুটি ৩০ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যায়।

৬। প্রসূতি ছুটি :

কোন মহিলা কর্মচারী প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে প্রবেশের তারিখ, এর মধ্যে যা আগে ঘটবে, ঐ তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাস ছুটি মঞ্জুর করবেন। একজন মহিলা কর্মচারী সমগ্র চাকুরি জীবনে ২(দুই) বারের অধিক প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য হবেন না। প্রসূতি ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করতে হবে না। এ ছুটি ছুটির হিসাব হতে বিয়োগ হবে না।

৭। চিকিৎসালয় ছুটি :

যে সমস্ত কর্মচারী কর্তব্য পালনকালে দুর্ঘটনার বা অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে তারা এ প্রকার ছুটি পেতে পারেন। পুলিশ বিভাগের, বন বিভাগের এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মচারীবৃন্দ এ প্রকার ছুটি পেয়ে থাকেন। প্রতি তিন বছরে পূর্ণ গড় বেতনে তিন মাস পর্যন্ত দেয়া যায়। এ প্রকার ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করতে হয় না এবং এ ছুটি ছুটির হিসাব হতে বিয়োগ হবে না।

৮। বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি :

সরকারী নৌযানে কর্মরত কোন অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার অথবা পেটি অফিসার আহত হলে বা অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে অথবা নৌযানের অভ্যন্তরে চিকিৎসার জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি পেতে পারেন।

৯। অবকাশ বিভাগের ছুটি :

অবকাশ বিভাগের স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী যে পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেছেন তিনি উক্ত বছরের কর্মকালীন গড় বেতনে কোন ছুটি প্রাপ্য হবেন না। উক্ত রূপ সরকারী কর্মচারী যে বছর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেননি তিনি উক্ত বছরের জন্য নির্ধারিত

পূর্ণ অবকাশের জন্য ৩০ দিন এর অনুপাতে যে কতদিন অবকাশ ভোগ করেননি, ঐ কতদিনের জন্য গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য হবেন।

১০। বিভাগীয় ছুটি :

জরিপ বিভাগের ঢাকায় অবস্থিত সদর দপ্তরের অফিস সংস্থাপনের কর্মচারী নয়, কিন্তু পার্টির সহিত সংযুক্ত, এমন কর্মচারীদেরকে বিভাগীয় ছুটি প্রদান করা হয়। যে সমস্ত কর্মচারীর চাকুরি সাময়িকভাবে প্রয়োজন পড়ে না শুধু সে ধরনের কর্মচারীকে বিভাগীয় ছুটি প্রদান করা হয়। কর্মচারীর প্রয়োজনে নয় কিন্ত সরকারের স্বার্থে ছয় মাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত এ প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়। এ ছুটি অর্ধ গড় বেতনে হয়ে থাকে।

১১। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি :

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৫বিধি অনুসারে ছুটি পাওনা না থাকা সত্ত্বেও একজন স্থায়ী কর্মচারীকে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের শর্তে ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে পিআরএল এর ক্ষেত্র ব্যতীত ১২ মাস প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যায়। সমগ্র কর্মজীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ বার মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

১২। অবসর উত্তর ছুটি :

ক. গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৪৭ এর ধারা-৭ এর বিধান মোতাবেক অবসর উত্তর ছুটি দেওয়া হয়। উক্ত আইনের ধারা- ৪ এর অধীনে ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণের এবং ধারা- ৯ (১) এর ক্ষেত্রে এর অধীনে চাকরির ২৫ বৎসর মেয়াদ পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ধারা (২) এর অধীনে চাকরির ২৫বৎসর মেয়াদ পূর্তিতে সরকার কর্তৃক অবসর দানের ক্ষেত্রে অবসর উত্তর ছুটি প্রাপ্য।

খ. বর্তমানে প্রচলিত ছুটির বিধান অনুযায়ী ৬ মাস গড় বেতনে ও ৬ মাস অর্ধগড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের পরিবর্তে, কোন ব্যক্তির ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

গ. অবসর উত্তর ছুটি ভোগ করার পরও ছুটি পাওনা থাকিলে সর্বাধিক ১৮ মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবে। এইক্ষেত্রে প্রাপ্য অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

ঘ. কোন কর্মচারী ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে যদি অবসর উত্তর ছুটি গ্রহণের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রশাসনিক কারণে তাহার ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে অবসর উত্তর ছুটির আদেশ জারি করিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্ব তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে পরবর্তী সময় অবসর উত্তর ছুটি প্রদান করা যাইবে।

ঙ. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইহার অধীনস্থ অবসর উত্তর ছুটি ভোগরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কোনরূপ হয়রানী না করিয়া তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

চ. চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুর তারিখে অবসর গ্রহণ ধরিয়া পাওনা সাপেক্ষে ছুটির পরিবর্তে প্রাপ্য নগদ অর্থ পরিবারকে প্রদান করা যাইবে।

১৩। বাধ্যতামুলক ছুটি :

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৫(১) এর অধীনে নাশকতামূলক কার্যক্রমের অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং ১১(১) বিধির অধীনে অসদাচরণ, ডিজারশন ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

১৪। বিনা বেতনে ছুটি :

পেনশন মঞ্জুরির কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতির কালকে ভূতাপেক্ষিকভাবে ভাতাদি বিহীন ছুটিতে রূপান্তর করতে পারবেন। এ ছাড়া ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অনুপস্থিত থাকলে এবং অনুপস্থিতির কাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি বর্ধিত করা না হলে, উক্ত সময়ের জন্য কোন ছুটিকালীন বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

১৫। নৈমিত্তিক ছুটি :

নৈমিত্তিক ছুটি চাকুরি বিধিমালা স্বীকৃত ছুটি নয় এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুপস্থিতিতে কাজে অনুপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হয় না। নৈমিত্তিক ছুটি ভোগকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তবে ছুটি প্রদানকারী ও ছুটি ভোগকারী কর্মকর্তা উভয়েই দায়ী থাকবেন। পঞ্জিকাবর্ষে সকল সরকারী কর্মচারী সর্বমোট ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারেন। একসংগে ১০ দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না। তবে পার্বত্য জেলায় কর্মরত সকল কর্মচারীকে এক বছরে মঞ্জুরযোগ্য ২০

দিনের নৈমিত্তিক ছুটি একত্রে ভোগ করতে দেয়া যেতে পারে। সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্যকোন সরকারী ছুটির পূর্বে অথবা পরে ৩ দিনের বেশী ছুটি সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়া যাবে না। নৈমিত্তিক ছুটি ভোগকারী কোন কর্মচারী সদর দপ্তর ত্যাগ করতে পারবেন না।

১৬। সাধারণ ও সরকারী ছুটি :

সাধারণ ছুটি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ২৫ ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ ছুটি বলতে সাপ্তাহিক ছুটি এবং অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে যে সমস্ত দিনকে সাধারণ ছুটি হিসেবে ঘোষনা করা হয়, ঐ সমস্ত দিনকে বুঝাবে। শহীদ দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মে দিবস, জুমাতুল বিদা, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা, বৌদ্ধ পূর্নিমা, দুর্গাপুজা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, বিজয় দিবস, যীশু খ্রিষ্ট্রের জন্ম দিন ও জন্মাষ্টমী।

উক্ত দিবস ও তারিখ ব্যতীত সরকার সময়ে সময়ে আরো কতিপয় তারিখ ও দিবসকে সাধারণ ছুটির অন্তর্ভূক্ত করে থাকে।

ঐচ্ছিক ছুটি :

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যে সমস্ত ছুটি ভোগ করা কর্মচারীর ইচ্ছাধীন, তা ঐচ্ছিক ছুটি। যে কোন সম্প্রদায়ের একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর নিজ ধর্ম অনুযায়ী বছরে সর্বমোট তিন দিন ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি :

সরকার সাধারণ ছুটি ব্যতীত যে সমস্ত দিনসমুহকে সাধারণ ছুটির সহিত সংযুক্ত করে বা পৃথকভাবে সরকারী আদেশ বলে কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য উক্ত বছরের সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন, যে সমস্ত দিন বা দিনসমুহকে নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি হিসেবে গণ্য। শব-ই বরাত, বাংলা নববর্ষ, শব-ই ক্বদর ঈদ-উল ফিতরের পূর্বের ও পরের দিনসমুহ, ঈদ-উল আযহার পূর্বের ও পরের দিন বা দিনসমূহ, মহরম (আশুরা)।

১৭। শ্রান্তি বিনোদন ছুটি :

কন্টিনজেন্ট কর্মচারী, আনুষাঙ্গিক ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ব্যতীত সকল প্রকার সরকারী কর্মচারী শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রতি তিন বছরে ১৫ দিনের গড় বেতনে ছুটি সহ ১ মাসের বেতনের সমান বিনোদনভাতা প্রাপ্য হবেন। বিনোদন ভাতার জন্য ৩ বৎসর গণনা করা হবে পূর্ববর্তী ছুটির আবেদনকৃত তারিখ হতে। অবসর গ্রহণ সম্পন্ন কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পিআরএল ভোগরত কর্মচারীরা এ ভাতা পাবেন না। ছুটি মঞ্জুরী ব্যতিরেকে এ ভাতা দেয়া যাবে না।

১৮। বহিঃবাংলাদেশ ছুটি :

অর্জিত ছুটি বাংলাদেশের বাহিরে কাটাতে হলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী সরকারী কাজে বা প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাহিরে যাওয়ার আগেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ছুটির মঞ্জুরি গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে অর্জিত ছুটি কাটানোর পর ভ্রমন সময় যোগ হবে না। অবসর উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ মঞ্জুর করবেন। অবসর উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্যদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ছুটিকালীন বেতন :

মাসিক বেতনের সমহারে গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাবেন। অর্ধগড় বেতনে ছুটিকালীন গড় বেতনের অর্ধহারে বেতন পাবেন। ছুটি দেশে ভোগ করেন আর বিদেশেই ভোগ করেন না কেন বেতন বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদেয় হবে।

ছুটিকালীন প্রাপ্য সুবিধাদি :

ক) অসাধারণ ছুটিকালীন সময় ব্যতীত অন্যান্য ছুটিকালীন বেতন।
খ) বাড়ি ভাড়া ভাতা পূর্ণ হারে।
গ) চিকিৎসা ভাতা পূর্ণ হারে।

পাঠ- ১২
অসংক্রামক রোগ

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ।	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মিঃ
২	অসংক্রামক রোগ, রোগের কারণ ও প্রতিকার । বিভিন্ন প্রকার অসংক্রামক রোগের বিবরণ ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	৪০ মিঃ
৩	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

বিজ্ঞানের অবিস্মরনীয় উন্নতির ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা, হাম এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ সহজেই চিকিৎসাতে নিরাময় এবং প্রতিরোধযোগ্য। এই সমস্ত রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। সারা বিশ্ব শুধু সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে ব্যস্ত। অনেকগুলো সংক্রামক রোগ দ্রুত নিরাময় করা সম্ভব আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে নিরাপদ পানি, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা পদ্ধতি, কার্যকরী টিকা কর্মসূচী, সর্বোপরি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সংক্রামক ব্যাধি কমে যাচ্ছে, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। সাথে সাথে বয়স জনিত কারণে বার্ধক্যজনিত রোগ, যেমন- অস্টিও পোরোসিস, অস্টিও আর্থরাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি বাড়ছে এবং হয়ে উঠছে বড় ঘাতক।

কিন্তু সারা বিশ্বে অসংক্রামক রোগ নিরব ঘাতকের মতো ধেয়ে আসছে এবং এসব ব্যাধি আশংকাজনক হারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংক্রামক রোগ ধীরে ধীরে কমছে, দ্রুত বাড়ছে অসংক্রামক রোগ এবং জনস্বাস্থ্য সমস্যায় বড় হুমকি হিসাবে দেখা দিয়েছে। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনীতির উপর প্রভাব ও চাপ পড়তে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সংক্রামক ব্যাধি থেকে অসংক্রামক রোগ ব্যাপকতা অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের মোট মৃত্যুর ৬০ ভাগের জন্য দায়ী অসংক্রামক ব্যাধি। যার মধ্যে ৮০ ভাগ মৃত্যু হয় এদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে। পূর্বে ধারণা করা হতো যে, অসংক্রামক ব্যাধি শুধুমাত্র ধনী দেশে বসবাসকারী এবং বয়স্ক লোকের হয়। প্রকৃতপক্ষে এ রোগে আক্রান্তদের অর্ধেক কমবয়েসী এবং নিম্ন আয়ের দেশ গুলোতে অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর শতকরা ২৭.৩ ভাগ হয় বিভিন্ন প্রকার অসংক্রামক রোগের কারণে। এদেশে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত। হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে অসংক্রামক রোগ। মৃত্যুর প্রধান ১০টি কারণের মধ্যে ৫টি হচ্ছে অসংক্রামক রোগ। এই সকল রোগ হচ্ছে কিডনি, ফুসফুস ও লিভার প্রদাহ, ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস প্রভৃতি।

বর্তমানে দেশে অসংক্রামক রোগের শতকরা ১৭.৯ ভাগ উচ্চ রক্তচাপ, ৩.৭ ভাগ ক্যান্সার, ৩ ভাগ এ্যাজমায়, ডায়াবেটিসে ৩.৯ ভাগ ও ২.৪ ভাগ ভুগছে স্ট্রোকে। শ্বাসতন্ত্রে বাধাজনিত রোগে মোট জনগোষ্টীর ৩ ভাগ ও হাসপাতালে ভর্তিকৃতদের মধ্যে ১৯ ভাগ এ রোগে আক্রান্ত। ৩০ বয়সের বেশি নারী পুরুষের ৪৯ হাজার মুখগহবর এর ক্যান্সার, ৭১ হাজার ল্যারিনজিয়াল ক্যান্সার ও ১ লাখ ৯৬ হাজার ফুসফুসের ক্যান্সারের রোগী বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুত্রে জানা যায়। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে অর্থনীতির উপর চরম প্রভাব পড়ছে। এসব রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাধারণ কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই রোগের ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব নয়। কারণ এই রোগে আক্রান্তরা দীর্ঘদিন ধরে ভোগে।

অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ ঃ

সংক্রামক রোগ ধীরে ধীরে কমছে। আর দ্রুত বাড়ছে অসংক্রামক রোগ। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অশিক্ষা এবং চিকিৎসার অপ্রতুলতা এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলছে। এসব রোগ চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ করার বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। মানুষের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক অস্থিরতা, খাদ্যভ্যাস, যান্ত্রিক জীবন সবকিছু মিলিয়েই অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কিছু কারণ যেমন-

- কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম না করা

- অলস জীবনযাপন করা,স্থূলতা বা অতিরিক্ত মোটা হওয়া
- ধুমপান, তামাক পাতা, জর্দ্দা, মাদক সেবন
- অতিরিক্ত টেনশন, মানষিক চাপ
- খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, শাক সবজি ফল-মূল কম খাওয়া, অধিক ক্যালরিসমৃদ্ধ ও অধিক চর্বি-শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস, অতিরিক্ত মাত্রায় কোমল পানীয় গ্রহণ
- খেলার মাঠের অভাব, বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা বা খেলাধুলার বিলোপ, টেলিভিশন আর কম্পিউটার গেম ও ফেসবুক
- গাড়ী-লিফট-চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহারের প্রবণতা
- খাদ্যে কেমিক্যাল ও ভেজাল
- জলবায়ু দুষন
- আর্থিক অসচ্ছলতা ও অশিক্ষা
- অপরিকল্পিত নগরায়ন
- নিয়ন্ত্রণহীন তামাক ও খাদ্যশিল্প
- অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট
- ক্রমবর্ধমান কোমল পানীয় ও ফাষ্ট ফুডের কারখানা
- দক্ষ জনশক্তি ও সম্পদের ঘাটতি ।

কিভাবে প্রতিরোধ করা যাবে ঃ

অসংক্রামক রোগ আজ মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিকার ও প্রতিরোধযোগ্য । রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের ব্যাপারে বেশী যত্নবান হতে হবে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে-

- মানসিক ও শারীরিক চাপ সামলাতে হবে । নিয়মিত বিশ্রাম, সময় মতো ঘুমানো, নিজের সখের কাজ করা, নিজ ধর্মের চর্চা করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক শান্তি বেশী হবে ।
- কায়িক শ্রম ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে । বাড়তি ওজন কমাতে হবে ।
- ধুমপান, মদ্যপান, মাদক দ্রব্য, তামাক পাতা ও জর্দ্দা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ।
- খাদ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা : কম চর্বি ও কম কোলেস্টারল যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে । লবণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তরকারীতে প্রয়োজনীয় লবণের বাইরে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে ।
- শিক্ষা ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী । এসব রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

উপসংহার ঃ

যেহেতু একবার আক্রান্ত হলে এ ধরনের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর, তাই সচেতনতা প্রতিরোধের কোন বিকল্প নাই ।

পাঠ- ১৩

আর্সেনিক

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ।	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মি:
২	আর্সেনিক কী? আর্সেনিকের সমস্যা, সহনীয় মাত্রা ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	১৫ মি:
৩	আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণসমূহ ও কার্যকর প্রতিকার ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	২৫ মি:
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

আর্সেনিক মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর এক ধরনের বিষ । এর কোনো রং, গন্ধ ও স্বাদ নেই । বাংলাদেশের মানদন্ড অনুযায়ী পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রো গ্রামের হলে সেটি নিরাপদ, যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে এটি ১০ মাইক্রো গ্রামের কম হতে হবে (তথ্যসূত্র: বিবিএস) ।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ এলাকার টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক কম পাওয়া গেছে । আর্সেনিক রয়েছে এমন টিউবওয়েলের পানি খাওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকার মানুষ আর্সেনিক জনিত রোগের আক্রান্ত হচ্ছে, যারা আর্সেনিক দূষণের নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার তীব্র ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে । তাই এদের জন্যে প্রতিকার ও জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ।

অনেকে এ রোগের কারণে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাচ্ছে । সে ক্ষেত্রে আর্সেনিক মুক্ত পানি নিশ্চিত করার উপায় গুলি জানা থাকলে পরিবারে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মুক্ত রাখা সম্ভব ।

আর্সেনিক কেন সমস্যাজনক

বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকার নলকূপের পানিতে আর্সেনিক বিষ রয়েছে । পানিতে আর্সেনিক বিষ থাকলেও আমরা তা খালি চোখে দেখতে পাই না । এ কারনে আমরা না জেনেই অনেক সময় আর্সেনিক বিষ রয়েছে এমন নলকূপের পানি পান করি । আর এভাবে আর্সেনিক বিষ পান করার কারণে আমরা আর্সেনিক আক্রান্ত হই ।

পানি বা অন্য কোনো মাধ্যম হতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি পরিমাণে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে, ধীরে ধীরে দেহে তা জমা হতে থাকে এবং মানুষের দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া দেখা দেয় । মানুষের দেহে সাধারণত আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার লক্ষণ ২ থেকে ১০ বছর অথবা এরচেয়েও বেশি বছর পর দেখা যায় । এটি নির্ভর করে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর । আর্সেনিক ছোঁয়াচে বা বংশগত রোগ নয় ।

আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা

প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম । ০.০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে সে পানি পান করা ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না ।

আর্সেনিক রোগীর লক্ষণসমূহ

কোনো ব্যাক্তির চুল, নখ ও চামড়া পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, সে আর্সেনিকে আক্রান্ত কিনা । তবে এক জনের শরীরে আর্সেনিকের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৬ মাস থেকে ২০ বছর অথবা এর চেয়ে বেশী বছর সময় লাগে এবং তিনটি পর্যায়ে লক্ষণ গুলো দেখা দেয় ।

প্রথম পর্যায়ে অল্প মাত্রায় আর্সেনিকে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলো :

- রোগীর গায়ে (যেমন বুকে, পিঠে, পেটে) কালো দাগ দেখা দেয় । চামড়া রং কালো হয়ে যায় বা ছোট ছোট কালো দাগ হয় ।
- হাত ও পায়ের তালু শক্ত খস খসে হয়ে যায় ও ছোট ছোট শক্ত গুটি দেখা দিতে পারে । পরে কালো কালো দাগ হয় ।
- গায়ের চামড়া মোটা ও খস খসে হয়ে যায় ।
- বমি বমি ভাব এবং বমি হয়; পাতলা পায়খানা হয় ।
- খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি, রক্ত আমাশয়, মুখে ঘা ইত্যাদি দেখা দেয় ।
- কখনো কখনো জিহবার উপর ও গায়ের ভিতর কালো হয়ে যেতে পারে ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষণ সমূহ:

- চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় সাদা, কালো বা লাল দাগ দেখা দেয় ।
- গাত-পায়ের তালু ফেটে যায় ও শক্ত গুটি ওঠে ।
- হাত-পা ফুলে ওঠে ।

তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণসমূহ :

- কিডনি, লিভার ও ফুসফুস বড় হয়ে যায় ও টিউমার হয় ।
- হাত-পায়ে ঘা হয়, পচন ধরে ।
- চামড়া, মূত্রথলি, ফুসফুসে ক্যান্সার হয় ।
- কিডনি ও লিভার অকেজো হয়ে যায় ।
- জন্ডিস হয় ।
- পেটে ও মাথায় ব্যথা হয় ।
- রক্ত বমি হয় ।

আর্সেনিকে আক্রান্ত হলে করণীয়

- আর্সেনিক রোগের উপর্সগ দেখা দিলে ডাক্তার অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে দেখা করতে হবে ও তাঁর পরামর্শ মেনে চলতে হবে ।
- অবশ্যই আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করতে হবে ।
- আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগী সব ধরনের খাবার খেতে পারেন । তবে তাজা শাক-সবজি, ফলমূল ও পুষ্টিকর খাবার বেশি করে খেতে হবে ।
- নদী, পুকুর, বিল ইত্যাদির পানি ছেঁকে ২০ মিনিট ফুটিয়ে পান করা যায় ।
- বর্ষা কালে বৃষ্টির পানি পান করা যেতে পারে, এ জন্য বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পর পানি ধরতে হবে ।

আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি করবেন

আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয়

- নলকূপ বসানোর আগে মাটির নিচের পানিতে আর্সেনিক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;
- পুরানো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, টিউবওয়েল বসানোর আগে আশে পাশের টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করতে হবে;
- টিউবওয়েল বসানোর পর, গোড়া বাঁধানোর আগে আর্সেনিক পরীক্ষা করাতে হবে;
- টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে টিউবওয়েলের মুখ লাল রং করতে হবে । পানিতে আর্সেনিক না থাকলে সবুজ রং করতে হবে । লাল রং দেখলে ঐ নলকূপের পানি খাওয়া যাবে না;
- আর্সেনিক দূষণ মুক্ত টিউবওয়েলের পানি প্রতি ৬ মাস পর পর পরীক্ষা করাতে হবে । দেখতে হবে পানি আর্সেনিক দূষনমুক্ত আছে কিনা;
- আর্সেনিক যুক্ত পানি রান্না ও খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না;
- পাত কুয়ার পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করে পান করতে হবে;

- পুকুর বা নদীর পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে। এজন্য এক কলসি (২০লিটার) পানিতে আধা চামচ (১০মিলিগ্রাম) ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ফিটকিরি মিশালে পানির ময়লা কলসির নিচে জমা হবে সাবধানে পাত্রের উপরের পরিষ্কার পানি অন্য পাত্রে ঢেলে ফুটিয়ে পান করতে হবে;
- বৃষ্টির পানি আর্সেনিক মুক্ত। তাই বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পর পরিষ্কার পাত্রে ধরে সেই পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়।
- আর্সেনিক যুক্ত পানি ফুটিয়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ ফুটালে আর্সেনিক দূর হয় না বরং পানি শুকিয়ে গেলে তাতে আর্সেনিকের ঘনত্ব আরো বেড়ে যায়।

প্রতিরোধক ব্যবস্থা

আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে মুক্তির জন্য আপাতত প্রতিরোধক বাবস্থাই সবচেয়ে উপযোগী। ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয়গুলো হলো:

১. আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানি পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার না করা।
২. নিকটে আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ পাওয়া না গেলে পুকুর বা নদী হতে ১ কলসি পানিতে আধা চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা রেখে দিয়ে পরে উপর থেকে তলানিবিহীন পরিষ্কার পানি পান করতে হবে।
৩. বৃষ্টির পানি যেহেতু আর্সেনিকমুক্ত, তাই বৃষ্টি আরম্ভ হবার ৫ মিনিট পর সরাসরি পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা পান করতে হবে।

আর্সেনিক মুক্তকরণ

১.পিএসএফ-এর মাধ্যমে শোধন সক্ষম ফিল্টারের মাধ্যমে পানি আর্সেনিকমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
২.বাংলাদেশে আর্সেনিকযুক্ত পানি থেকে আর্সেনিক মুক্ত করার একটি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি রয়েছে, যাকে বলা হয় "তিন কলসি পদ্ধতি"। এজন্য তিনটি কলসি একটির উপর অপরটি রাখতে হয়। সর্ব উপরের কলসিতে রাখতে হয় লোহার কণা ও মোটা দানার বালু; মাধখানে কলসিতে রাখতে হয় কাঠ কয়লা ও মিহি দানার বালু এবং একেবারে নিচের কলসি থাকবে খালি। আর্সেনিকযুক্ত পানি এনে ঢালতে হবে সর্ব উপরের পাত্রে, তা ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও আর্সেনিকমুক্ত হয়ে জমা হবে সর্ব নিচের কলসিতে। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিকের মাত্রা অন্ততপক্ষে ৫০ পিপিবি (১ বিলিয়নে ৫০%) এর নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব।

পাঠ ঃ ১৪

মশাবাহিত রোগ

চিকুনগুনিয়া (Chikungunya)

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২	চিকুনগুনিয়া ও এর বিবরণ। রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা	১৫ মিঃ
৩	চিকুনগুনিয়া রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	২৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক।	১০ মিঃ

চিকুনগুনিয়া ও এর বিবরণ ঃ

চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) মশাবহিত ভাইরাসজনিত একটি রোগ। আমাদের অতি পরিচিত ডেঙ্গুর সঙ্গে এর বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। ডেঙ্গুর মতোই এ ভাইরাসটিও *এডিস ইজিপটাই* (*Aedes aegypti*) এবং *এডিস এ্যালবোপিক্টাস* (*Aedes albopictus*) মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গুর মতই মানবদেহ থেকে মশা এবং মশা তেকে মানবদেহে ছড়িয়ে থাকে। মানুষ ছাড়াও বানর, পাখি এবং ইঁদুরে এ ভাইরাসের জীবন-চক্র বিদ্যমান।

Aedes aegypti ***Aedes albopictus***

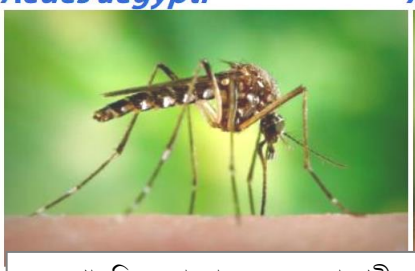

এ মশাগুলি চেনা যায় এর কলো শরীরে ও পায়ে সাদা ডোরাকাটা দাগ দেখে। তারা দিবাকালিন কামড়ে আক্রমনাত্বক এবং ভোরবেলা ও সন্ধ্যেবেলায় সর্বাধিক খাদ্য গ্রহণ করে।

চিকুনগুনিয়া শব্দটি আফ্রিকার তানজানিয়ার কিমাকোন্ডে (Kimakonde) ভাষার কুনগুনিয়ালা (Kungunyala) শব্দটি থেকে উৎপত্তি । যার অর্থ (ব্যাথায়)প্যাঁচানো বা কোঁচকানো/কোঁকড়ানো অবস্থা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র তথ্য মতে ১৯৫২ সালে দক্ষিন তানজানিয়ায় এটি প্রথম দেখা যায়।

অনেকের ভাইরাস জ্বর বা ডেঙ্গু জ্বর হয়ে সেরে যাওয়ার পরও দেখা যায় দীর্ঘদিন শরীর ভাল যাচ্ছে না। সাধারণত যে কোন ভাইরাস কিংবা ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। অথচ দেখা যাচ্ছে জ্বর সেরে গেলেও রোগী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ও দুর্বলবোধ করছেন; বিশেষ করে বিভিন্ন গিটে গিটে ব্যথা, দুর্বলতা এবং ক্লান্তি খুব ভোগাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ডেঙ্গু হিসেবে সন্দেহ করা হলেও এ রোগটি সম্ভবত ডেঙ্গু নয়, বরং এটি চিকুনগুনিয়া নামক একটি মশাবাহিত ভাইরানজনিত রোগ। চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পরবর্তী দুই থেকে চারদিনের মধ্যে আকস্মিক জ্বর এবং অস্থিসন্ধিতে ব্যথা শুরু হয়, যা কয়েক সপ্তাহ, মাস এমনকি বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। এ রোগে মৃত্যু প্রতি দশ হাজাওে একজন বা এর চেয়ে কম। অর্থাৎ মৃত্যু ঝুঁকি নেই বললেই চলে। তবে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগের জটিলতা তুলনামূলক একটু বেশী হতে পারে। এই রোগ প্রতিরোধে মশা নিয়ন্ত্রণ ও ঘুমানোর সময় মশারি টাঙানো ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ:

সাধারণ জ্বর বা ডেঙ্গু জ্বরের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকুনগুনিয়া একটু ভিন্ন রকম হয়। সাধারণত মশা কামড়ানোর ৩ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এই জ্বরের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও কোনো উপসর্গই প্রকাশ পায় না। এ রোগটি সাধারণত আকস্মিক জ্বর, অস্থিসন্ধির ব্যথার মাধ্যমে শুরু হয়। নিম্নে চিকুনগুনিয়া জ্বরের লক্ষণ বা উপসর্গগুলি বর্ণনা করা হলো ঃ

- চিকুনগুনিয়ার প্রথম লক্ষণই হলো হঠাৎ করে উচ্চমাত্রার জ্বর আসা। আবার জ্বর চট করে ছাড়তেও চায় না। সাধারণত জ্বরের প্রচলিত ওষুধে অনেক সময় কোনও কাজই হয় না। এ জ্বর অনেকটা ডেঙ্গু জ্বরের মতোই। দেহের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে প্রায় ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে। এ জ্বরে কোন কাঁপুনি বা ঘাম হয় না। জ্বও সাধারণত ২ থেকে ৫ দিন থাকতে পারে; এরপর এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। এরকম লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

- চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হলে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গাঁটের ব্যথা শুরু হয়। প্রথমে হাত এবং পা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সারা শরীরে ব্যথা অনুভুত হতে শুরু করে। ব্যথা ক্রমশঃ বাড়তে থাকার ফলে শারীরিক দুর্বলতাও বাড়তে থাকে।
- চিকুনগুনিয়া জ্বরের ফলে গাঁটের ব্যাথার পাশাপাশি পেশীর ব্যথার সমস্যাও দেখা যায়। অনেক সময় পেশী এতটাই শক্ত হয়ে যায় যে চলা ফেরার সমস্যা শুরু হয় এবং ব্যথা সহ্য কার অসম্ভব হয়ে পড়ে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কওে অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা হয়, এমনকি ফুলেও যেতে পারে। পেশীতে ব্যথা কিংবা অস্থিসন্ধির ব্যথা জ্বর চলে যাওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে পারে যা অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে স্বাভাবিক কাজ করতে বাধা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা এতই বেশী হয় যে রোগীর হাঁটতে কষ্ট হয় কিংবা সামনের দিকে বেঁকে হাঁটে।

- রোগের শুরুতে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোগ শুরু হওয়ার দুই থেকে তিন দিন পর জ্বর কমতে শুরু করলে ফুসকুড়ির আবির্ভাব হতে পারে।

- অনিদ্রা হতে পারে।
- গায়ে লাল লাল দানার মত র‍্যাশ দেখা যেতে পারে।
- কনজাংটিভাইটিস হতে পারে।
- চিকুনগুনিয়া জ্বরে অসহ্য মাথা ব্যথা হতে পারে। এই জ্বরে দীর্ঘসময় ধরে মাথা ব্যথার প্রভাব থাকতে পারে যা শারীরিক কষ্ট দেয়া পাশাপাশি ঘুমের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ব্যঘাত ঘটায়।
- এই জ্বর হলে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে বার বার বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
- জ্বর এবং ব্যথায় কাতর হয়ে অনেকের মধ্যে অবসাদের প্রভাব দেখা যেতে পারে। ফলে কোন কাজেই মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না।
- অনেক ক্ষেত্রে চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা চোখের মধ্যে ব্যথা অনুভব হতে পারে। আবার অনেক সময় চোখের ব্যথা এতটাই বেড়ে যায় যে আলোর দিকে তাকাতে সমস্যা হয় এবং চোখ জ্বালা করে।
- সাধারণত বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা অনেক বেশী হয় এবং উপসর্গগুলি বেশিদিন থাকে।
- ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে জ্বর ভালো হয়ে গেলে কয়েকদিন দুর্বলতা বা ক্লান্তি লাগতে পারে কিন্তু সাধারণত এত দীর্ঘ সময় ধরে শরীর ব্যথা বা অন্য লক্ষণগুলো থাকে না।
- আবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হয়, যা অনেক সময় খুব ভয়াবহ হতে পারে। কিন্তু চিকুনগুনিয়া রোগে ডেঙ্গু জ্বরের মত রক্তক্ষরণ হয় না এবং রক্তের প্লেটলেট খুব বেশি হ্রাস পায় না।

রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা বিশেষ কওে ভাইরাস পৃথকীকরণ RT-PCR কিংবা সেরোলজির মাধ্যমে এ রোগ সনাক্ত করা যেতে পারে। রোগীর রক্তে ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া এন্টিবডি দেখে এ রোগ সনাক্ত করা যেতে পারে। এতে অনেক ক্ষেত্রে ২ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত লাগতে পারে।

চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসা মূলত রোগের উপসর্গগুলোকে নিরাময়ের মাধ্যমে করতে হয়। এ রোগের কোন প্রতিষেধক নেই এবং কোন টিকাও এখন পর্যন্ত আবিস্কার হয় নি। এ রোগে আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে এবং প্রচুর পানি বা অন্যান্য তরল খেতে দিতে হবে। জ্বরের জন্য সাধারণত প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে পানি দিয়ে শরীর মুছে দেয়া যেতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথার ওষুধ প্রযোজন হতে পারে। নিজে নিজে কোন ওষুধ না খাওয়াই ভাল। রোগীকে যেন মশা না কামড়ায় এ জন্য রোগীকে অবশ্যই মশারির ভেতর লাখতে হবে। কারণ আক্রান্ত রোগীকে কামড় দিয়ে পরবর্তীতে সুস্থ লোককে সেই মশা কামড় দিলে ওই ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হবেন।

প্রতিরোধ

চিকুনগুনিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন টিকা এখনও পর্যন্ত আবিস্খার হয়নি। এটি যেহেতু এডিস মশাবাহিত রোগ, তাই মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, ঘুমানোর সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো, লম্বা হাতাযুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরে থাকা, বাড়ির আশে পাশে পানি জমতে না দেয়া ইত্যাদি। শুধু স্ত্রী জাতীয় এডিস মশা দিনের বেলা কামড়ায়। আবার এরা একেবাওে অধিক ব্যাক্তিকে কামড়াতে পছন্দ করে। তাই দিনে ঘুমালেও অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে। এ মশার ডিম পানিতে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বালতি, ফুলের টব, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে অল্প পরিমাণ জমে থাকা পানিও ডিম পরিস্ফুটনের জন্য যথেষ্ট। যেহেতে এডিস মশা স্থিও পানিতে ডিম পড়ে তাই যেন বাড়ির আশেপাশে পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উপসংহার

ডেঙ্গুজ্বর সাধারণত চারবার পর্যন্ত হতে পারে। অপরদিকে চিকুনগুনিয়া একবার হলে সাধারণত আর হয় না। এছাড়া অনেক বিষয়ে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এ রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এডিস মশা প্রতিরোধ। এজন্য এডিস মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করা এবং মশা নির্মূল করার মাধ্যমে চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সাবধানতাই একমাত্র এ রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। এ রোগে মৃত্যুঝুঁকি নেই বললেই চলে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই এ রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পাঠ-১৫

অটিজম (Autism)

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ।	উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	১০ মিঃ
২	অটিজম সম্বন্ধে প্রথমিক ধারণা । অটিজমের কারণ, ভুক্তভোগী ও লক্ষণসমূহ ।	পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে উপস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ পাঠ ও আলোচনা ।	১৫ মিঃ
৩	অটিজমের সাথে বিভিন্ন সমস্যা ও মাঠকর্মীদের দ্বায়িত্ব ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা ।	২৫ মিঃ
৪	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন ।	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

অটিজম কী ও এর কারণ

অটিজম শিশুদের বিকাশজনিত সমস্যা যেখানে সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের পরিবর্তনই প্রধান বিষয় । যার লক্ষণ সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায় । অটিজম থাকলে শিশু তার পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না । যেমন ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না, নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, আচরণের সমস্যা দেখা দেয় এবং একই কাজ বা আচরণ বার বার করতে থাকে বা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে । অটিজমের সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি ।

বিশ্বে প্রতি ১১০ জনে ১ জন শিশু এ সমস্যায় ভুগছে । বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রায় ০.৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৮ জন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের বিভিন্ন রোগ সনাক্ত করণের পদ্ধতিতে অটিজমকে একটি ব্যাপক বিকাশজনিত সমস্যা হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে ।

অটিজম কাদের হয়

যে কোনো শিশুর অটিজম হতে পারে । মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চার গুন বেশি । সাধারণত শিশুর বয়স ৩ বছর হবার আগেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণ গুলো প্রকাশ পায় । বাবা মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শিশুর প্রতি বাবা-মায়ের ব্যবহার এসবের সাথে শিশুর অটিজম হবার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি । তাই শিশুর অটিজম থাকলে কোনোভাবেই বাবা-মায়েরা যেন নিজেদের দায়ী না করেন বা নিজেদের অপরাধী মনে না করেন ।

অটিজম এর সাধারণ লক্ষণ

সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা

- অটিজম আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় -স্বাভাবিক একটি শিশু যেভাবে বেড়ে ওঠে, যেভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলোর সাথে ধীরে ধীরে যোগাযোগ তৈরি করে সে তা করতে পারে না ।
- বাবা মা বা প্রিয়জনের চোখে চোখ রাখতে, মুখভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের চাওয়া বা না-চাওয়া বোঝাতে সে অপারগ হয় ।
- সাধারণত সমবয়সী শিশুদের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনা - অমিশুক প্রবণতা থাকে ।
- কোনো ধরণের আনন্দদায়ক বস্তু বা বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয় না- যেমন স্বাভাবিক একটি শিশু কোনো খেলনা হাতে পেলে সেটার দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু অটিজম আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে এধরণের কোনো খেলনার প্রতি তার নিজস্ব কিছু আগ্রহ থাকলেও সেটা নিয়ে তার কোনো উচ্ছ্বাস থাকে না ।
- সাধারণত শারীরিক আদর, চুমু দেওয়া, চেপে ধরে কোলে নেয়াটা তারা মোটেই পছন্দ করে না ।

যোগাযোগের সমস্যা

- আশেপাশের পরিবেশ ও মানুষজনের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা কমে যায় । তবে মনে রাখতে হবে যে কেবল কথা শিখতে দেরী হওয়া মানেই কিন্তু অটিজম নয় ।

- কোনো ক্ষেত্রে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে হয়ত পারে কিন্তু একটি বাক্য শুরু করতে তার অস্বাভাবিক রকম দেরি হয় অথবা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে না ।
- কখনো বা দেখা যায় একই শব্দ বার বার করে সে উচ্চারণ করে যাচ্ছে ।
- ৩ বছরের কম বয়েসী শিশুরা তার বয়সের উপযোগী নানা রকম খেলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই তৈরি করে খেলে-কিন্তু অটিজম আছে এমন শিশুরা এ রকমটি করে না ।

আচরণের অস্বাভাবিকতা

- একই আচরণ বারবার সে করতে থাকে, যেমন হাত নাড়ানো, হাত দেখা, একইভাবে ঘোরা, বিভিন্ন জিনিস সারিবদ্ধভাবে সাজানো ।
- অতিরিক্ত শব্দ, আলো, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ ও নড়াচড়া ইত্যাদির প্রতি কম বা বেশিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখায় ।
- তারা নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে ভালবাসে । দৈনন্দিন কোনো রুটিনের হেরফের হলে তারা অস্থির হয়ে যায় ।
- কোনো কারণ ছাড়াই এরা হঠাৎ রেগে উঠে, হাসে, কাঁদে বা ভয় পায় ।
- অনেক সময় নিজের শরীরে বা অপরকে কামড় দেয় বা আঘাত করে ।

প্রধানত যে তিনটি ক্ষেত্রে অটিজম এর সমস্যা দেখা যায়

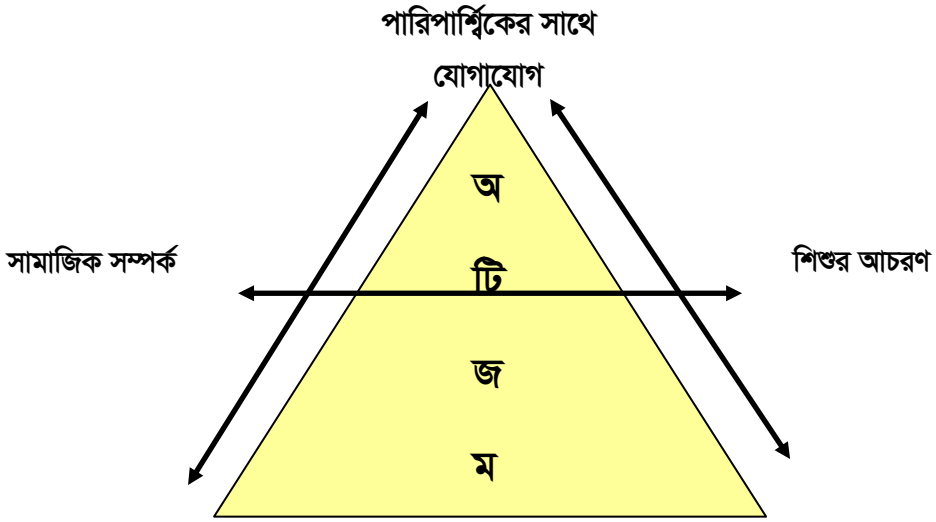

অটিজমের প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষণসমূহ

অটিজম রয়েছে এমন শিশুর চিকিৎসার প্রথম ধাপ হচ্ছে দ্রুত তার অটিজমের সনাক্তকরণ। এজন্য তিন বছর বয়সের শিশুর মধ্যে যে লক্ষণগুলি দেখলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ

- শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
  --একবছর বয়সের মধ্যে 'দা..দা ' 'বা..বা' 'বু..বু' উচ্চারণ না করা
  --দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা
- শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়
- অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে
- সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা
- পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
- অন্যের বলা কথা বার বার বলে
- বার বার একই আচরণ করা
- শব্দ, আলো ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো
- একটি নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করা, আশেপাশের কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা

এ লক্ষণগুলি সাধারণত তিন বছর বয়সের মধ্যে দেখা যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আরেকটু পরেও দেখা দিতে পারে। বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে উপরের কোনো লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য কোনো শিশুর মধ্যে থাকলেই ধরে নেয়া যাবে না যে তার অটিজম আছে। তা নিশ্চিত হবার জন্য অবশ্যই *বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের* পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অটিজমের সাথে অন্যান্য সমস্যা

অটিজমের সাথে প্রায়শই যে সমস্যাগুলো দেখা যেতে পারে:

- অতি চঞ্চলতা ও অমনোযোগিতা
- হঠাৎ অতিমাত্রায় রাগ করা
- খিঁচুনী রোগ
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা
- নিজেকে আঘাত করা
- ঘুমের সমস্যা
- কানে না শোনা
- অহেতুক ভীতি
- খাদ্যাভ্যাস জনিত সমস্যা
- অসংগতিপূর্ণ হাসি কান্না
- খাওয়া, ঘুম মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজম আছে এমন একজন শিশুর ইতিহাস

তিন বছরের ছোট্ট ছেলে 'অ'। তিন বছর বয়স হলেও সে ঠিকমত কথা বলতে শিখেনি। দুটি শব্দ ব্যবহার করে সে নিজে থেকে কোনো অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে অন্যের বলা কথা বারবার বলতে থাকে। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়না, সমবয়সীদের সাথে মেশে না। বাবা-মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকায়না। প্রতিদিন নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে ভালবাসে। রুটিনের ব্যতিক্রম হলে সে মনখারাপ করে বা রেগে যায়। মাঝে মাঝে সে কোনো কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে।

অটিজম এর লক্ষণ দেখা দিলে মাঠকর্মীদের করণীয়

সাধারণত দুই থেকে তিন বছর এর কাছাকাছি বয়সের যে কোনো শিশুর মধ্যে অটিজম এর লক্ষণ দেখা যায়। মাঠকর্মীগণ যদি দেখেন যে তার এলাকায় কোনো শিশুর মধ্যে অটিজম এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তবে দেরী না করে প্রথমে শিশুটির বাবা-মা/ অভিভাবকদের বিষয়টি ব্যাখা করতে হবে। তবে চিকিৎসক কর্তৃক কোনো সমস্যা নিশ্চিত হবার পূর্বে অভিভাবকদের এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত দেয়া যাবেনা। অভিভাবকদের তার শিশুসহ নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে/ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে হবে, প্রয়োজনে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে। যদি অভিভাবকেরা প্রথমে উৎসাহিত না হন তবে এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, শিক্ষক বা ধর্মীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। দরকার হলে সরাসরি চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসককে সংশ্লিষ্ট শিশুর বর্ননা দিয়ে ও চিকিৎসকের সাহায্যে অভিভাবকদের চিকিৎসা কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। মাঠকর্মীগণ অটিজম বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। অটিজম এর লক্ষণ বর্ণনা করার পাশাপাশি অভিভাবকদের আশান্বিত করতে হবে, যে উপযুক্ত পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ধরণের শিশুরাও প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

অটিজম কারা নির্ণয় করবেন

কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই তার অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যাবেনা। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। **শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, কিংবা অটিজম এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকই অটিজম নির্নয় করবেন।** তাই এ ধরণের চিকিৎসকের মতামত পাবার আগে কোনো শিশুর অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবেনা। তবে মাঠকর্মীগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্র বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকলে নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ জেলা সদর হাসপাতালে যোগাযোগ করবেন। মনে রাখতে হবে অটিজম নির্ণয়ের জন্য সুস্পষ্ট কোনো পরীক্ষা আবিস্কৃত হয়নি- এটি নির্নয়ের জন্য চিকিৎসকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট। তবে অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপক এর সাহায্যে অটিজম সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কোনো বই পড়ে, পত্রিকার স্বাস্থ্য পাতা পড়ে নিজে নিজে কোনো শিশুর অটিজম নির্ণয় করা যাবেনা। মাঠকর্মীগণ প্রাথমিকভাবে অটিজম সনাক্তকরণ ও শিশুর পরিচর্যায় অংশ নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবেন।

অটিজম সনাক্ত হলে অভিভাবকদের করণীয়

কোনো শিশুর অটিজম সনাক্ত হলে তার অভিভাবক বিশেষত বাবা-মায়ের দায়িত্ব বেড়ে যায় অনেক। অনেক সময় সচেতনতার অভাবে বাবা মায়েরা সঠিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন। অভিভাবকেরা যদি এ ধরণের কোনো লক্ষণ তাদের সন্তানের মধ্যে দেখে থাকেন তবে কালক্ষেপণ না করে নিকটস্থ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা মাঠকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অটিজম এর লক্ষণ গুলোকে আড়াল না করে, অপ্রপচার ও অপচিকিৎসায় প্রতারিত না হয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে চেষ্টা করুন শিশুটির মধ্যে অটিজম বা অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যা আছে কীনা। যদি অটিজম সনাক্ত হয়ে থাকে তবে চিকিৎসক এর পরামর্শ অনুযায়ী শিশুটির পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিন এবং এক্ষেত্রেও প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত মাঠকর্মীর সাহায্য গ্রহণ করুন অটিজম রয়েছে এমন শিশুর বাবা মায়ের জন্য সাধারণ কিছু পরামর্শ :

- **লক্ষণগুলোকে গোপন করবেন না:** সন্তানের এ ধরণের লক্ষণকে লুকিয়ে রাখবেন না বা আড়াল করবেন না।
- **হতাশ হবেন না :** অযথা ভেঙে পড়বেন না, হতাশাগ্রস্থ হবেন না । আপনার হতাশার কারণে সন্তানের ভবিষ্যৎ আরো বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকুন:** যে কোনো ধরণের বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও অপচিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকুন। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে অটিজম এর সনাক্তকরণ ও পরিচর্যার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কেন্দ্র রয়েছে। সন্তানকে দ্রুত সেখানে নিয়ে আসুন।

- **সমস্যাটির ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন:** সন্তানের অসুস্থতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন। পরিবারের কোনো সদস্য/ প্রতিবেশী /বন্ধু বান্ধবের বিজ্ঞান সম্মত পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- **পরিবারের সদস্যরা সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহন** করুন: পরিবারের সকল সদস্য মিলে শিশুর পরিচর্যা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনিত হোন।
- **নিজেদের দায়ী করবেন না:** অটিজমের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেন শিশুটির এ সমস্যা হলো তা নিয়ে অভিভাবকেরা নিজেদেরকে বা একে অপরকে দায়ী করবেন না। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
- **ধৈর্য ধরুন:** অটিজম যে ধরণের সমস্যা সে ধরণের সমস্যা সমাধানের কোনো রাতারাতি চিকিৎসা পদ্ধতি নেই- রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা পরিকল্পনা। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার মাধ্যমে এ সমস্যায় আক্রান্ত শিশু ফিরে আসতে পারে সমাজের মূল স্রোত ধারায়। তাই অযথা ধৈর্যহারা হওয়া ঠিক নয়। সমস্যাটির স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাবেন না।
- **সামাজিকতা শেখানো:** পরিবার থেকেই সামাজিকতা শেখাতে হবে সকল শিশুকে; আর অটিজম আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে তো বটেই। বড়দের সম্মান করা, হাসির প্রত্যুত্তরে হাসা, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির শিক্ষা দেবার জন্য শিশুর সাথে এসব সামাজিকতা আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে। সামাজিকতা বাড়ায় এমন আচরণ যেমন- সালাম দেওয়া, ধন্যবাদ দেয়া, টা টা, বাই বাই ইত্যাদির চর্চা থাকতে হবে।
- **সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:** বিভিন্ন দাওয়াত, সামাজিক অনুষ্ঠান, বড় আয়োজনে শিশুটিকে সংগে নিন। লোকলজ্জার ভয়ে শিশুটিকে ঘরে বন্দী করে রাখবেন না।
- **শিশুর সাথে খেলতে হবে:** শিশুটির সাথে প্রতিদিন কিছুটা সময় নিয়ে মজা করে খেলুন। শিশুটির সাথে আনন্দঘন ও আরামদায়ক পরিবেশে সময় কাটান।
- **শিশুকে খেলতে দিতে হবে:** অটিজম রয়েছে এমন শিশুকে খেলা বিষয়ে উৎসাহিত করুন ও খেলার সুযোগ করে দিন। একা একা খেলা যায় এমন খেলার প্রতি নিরুৎসাহিত করে অনেকে মিলে খেলতে পারে এমন খেলা, যেমন বল খেলা, কাল্পনিক/মিছেমিছি খেলা, ছোঁয়াছুয়ি, গঠনমূলক খেলা শেখাতে হবে এবং খেলতে উৎসাহিত করতে হবে।
- **কথা শেখাতে হবে:** অটিজম আছে এমন শিশুর অন্যতম প্রধান সমস্যা তার কথা শিখতে না পারা। কথা শেখানোর জন্য তাকে একটা করে জিনিস নিয়ে সেগুলোর নাম স্পষ্ট করে শেখাতে হবে। ছোট ছোট শব্দ আগে শেখাতে হবে। তার সাথে কথা বলতে হবে।
- **প্রতীকি ভাষার ব্যবহার বোঝাতে হবে:** শিশুকে ইশারা ইংগিত, অংগভংগি বা ছবির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা শেখাতে হবে। তার প্রয়োজনগুলোকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।
- **শব্দভান্ডার ব্যবহার করতে হবে:** শিশুর শব্দভান্ডার যাই হোকনা কেন সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যে শব্দগুলো সে ভালো পারে সেগুলি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাক্য তৈরি শেখাতে হবে, পাশাপাশি নতুন শব্দ শেখানোর জন্য ছবি, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- **ব্যক্তিগত কাজ শেখানো:** শিশুর নিজের ব্যক্তিগত কাজ- যেমন দাঁত ব্রাশ করা, জামা কাপড় পরা, নিজের যত্ন নিজে নেয়া, এধরণের কাজে পর্যায়ক্রমে অভ্যস্ত করাতে হবে। শিশুটিকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা যাবে না।
- **শখকে প্রাধান্য দেয়া:** শিশুকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। যেমন, গান গাইতে চাইলে সেটা শেখানো , ছবি আকঁতে চাইলে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে যে বিষয়ে শিশুর ঝোঁক আছে সেদিকে উৎসাহ দিতে হবে।
- **বাবা-মাকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে:** যে শিশুর অটিজম রয়েছে তার সঠিক পরিচর্যা এবং তার সর্বাঙ্গিন কল্যাণের জন্য বাবা- মা এবং প্রয়োজনে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও প্রশিক্ষন নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
- **গ্রুপ তৈরি ও গ্রুপে প্রশিক্ষণ:** বিশেষায়িত স্কুলের পাশাপাশি যে শিশুদের অটিজম আছে তাদের অভিভাবকেরা নিজেরাও গঠন করতে পারেন 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' বা 'অভিভাবক ফোরাম'। এতে করে নিজেদের সাধারণ সমস্যাগুলো আলোচনা করার পাশাপাশি সমাধানের পথও খুঁজে পেতে পারেন।
- **কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য পুরষ্কার:** শিশু যদি কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে তবে তার জন্য তাকে পুরষ্কার ও উৎসাহ দিতে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য তিরষ্কার না করে কারণ জানার চেষ্টা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- **দিনলিপি সংরক্ষণ:** একটি ডায়েরীতে শিশুর আচরণ ও অভ্যাসের তালিকাগুলো নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে। এতে করে বোঝা যাবে তার আচররণের পরিবর্তন কতটুকু হচ্ছে এবং কী হারে হচ্ছে। এটা দেখে পরবর্তী করণীয় ও আনুসংগিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

অটিজম এর সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও সেবা

আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে অটিজম রয়েছে এমন শিশুদের মধ্যে ১০%-২০% শিশু চার থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে মোটামুটি স্বাবলম্বি হতে পারে এবং সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে। আরো ১০%-২০% শিশু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে না, তারা বাসায় থাকে বা তাদের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষায়িত স্কুল ও বিশেষ প্রশিক্ষণের; বিশেষায়িত স্কুলে পড়ে, ভাষা সহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তারা সমাজে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থান করে নেয়। তবে বাকি শিশুরা সব ধরণের সহায়তা পাওয়ার পরও স্বাধীন ভাবে স্বাবলম্বী জীবন অতিবাহিত করতে পারে না- তাদের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ দিনের- প্রায় সারা জীবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা। বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় তাদের।
তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে শিশুর অটিজমের ব্যবস্থা দেয়া হয়-

- **প্রথমত**-অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুর বাবা মাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন; যাতে তারা বাড়িতে শিশুর আচরণগত পরিবর্তন আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। শিশুর অনাকাংক্ষিত আচরণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাংক্ষিত আচরণকে উৎসাহিত করতে হবে।

- **দ্বিতীয়ত**-এসব শিশুদের মূলধারার স্কুলে শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত শিশু মূলধারার স্কুলে যেতে সক্ষম নয় তাদেরকে বিশেষায়িত স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা একেবারেই স্কুলে যেতে অক্ষম তাদের জন্য বাড়িতে উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- **তৃতীয়ত**-ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তার ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে তাকে ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করতে হবে এবং ইশারার তাৎপর্য বোঝাতে হবে। ছড়া কবিতা, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্রের নাম, ছবির কার্ড ব্যবহার করা, গান, পাখির নাম, রঙের নাম, ফুলের নাম ইত্যাদি শেখাতে হবে। শিশুকে কোনো শব্দ বিকৃত করে না শিখিয়ে প্রকৃত উচ্চারণ শেখাতে হবে।

স্পীচ- ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী ও অকুপেশনাল থেরাপী এবং আবেগ ও আচরণগত সমস্যার জন্য বিহেভিয়ার থেরাপী, সাইকোথেরাপির প্রয়োগ করতে হবে।

কেনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে- তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। অটিজম এর সাথে কোনো ধরণের শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলোর চিকিৎসাও গ্রহণ করতে হবে।

অটিজম রয়েছে এমন শিশুদের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের সচেতনতা আর অটিজম নিয়ে দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। আর এই সচেতনতা ও পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। অটিজমের চিকিৎসায় পরিবারের- বিশেষত বাবা মায়েদের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশুর অটিজমকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, সেই সাথে নিতে হবে মানসিক প্রস্তুতি। অভিভাবকদের ইতিবাচক এবং গঠনমূলক আচরণই পারে অটিজম আছে এমন শিশুর বিকাশের পথকে অনেকখানি স্বাভাবিক ও সাবলীল করতে।

অটিজম ঃ কোথায় বিশেষ সহায়তা পাবেন

- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শিশু মনোরোগ বিভাগ ও 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক', শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, 'সেন্টার্ ফর নিউরোডেভেলপ্মেন্ট্ এন্ড অটিজম্ ইন চিল্ড্রেন' বিভাগ, শাহবাগ, ঢাকা।
- অটিজম রিসোর্স সেন্টার, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
- শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ।
- শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল, 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র', ঢাকা।
- মানসিক রোগ বিভাগ, সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।
- শিশু বিভাগ, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।
- সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, শিশু ও মানসিক রোগ বিভাগ, ঢাকা।
- সরকার অনুমোদিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুলসমূহ

পাঠ- ১৬

হাঁপানি (Asthma)

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১.	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২.	এ্যাজমা (হাঁপানি)ও লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মিঃ
৩.	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

হাঁপানি শ্বাসনালীর ভেতর মিউকাস আবরণীর প্রদাহজনিত এমন একটি রোগ যার ফলে শ্বাস গ্রহণ বা শ্বাস ত্যাগের সময় সাঁ সাঁ শব্দ হয় । এর কারনে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের পথ সংকুচিত হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় । শ্বাসনালীর হঠাৎ সংকোচনকে সাধারণত হাঁপানির আক্রমণ বলে । শ্বাসনালীর সংকোচনে উপসর্গ অল্প হয় অথবা ধীরে ধীরে হয় ।

হাঁপানির লক্ষণ

১ । শ্বাসকষ্ট

- ধুলাবালি বা ঠান্ডা থেকে শ্বাসকষ্ট
- সর্দি লাগার পর শ্বাসকষ্ট
- ব্যথা ও প্রদাহ জনিত কারনে রোগী ঔষধ সেবনের শ্বাসকষ্ট
- ব্যায়াম এর পর শ্বাসকষ্ট

২ । কাশি বিশেষ করে ধুলা বা ঠান্ডা থেকে শুষ্ক কাশি

৩ । শ্বাস নেয়া বা ছাড়ার সময় সাঁ সাঁ শব্দ এবং শ্বাস নেয়ার চেয়ে ফেলতে বেশি কষ্ট হওয়া

৪ । হঠাৎ করে বুকের উপর চাপ বা দমবন্ধ ভাব অনুভব করা ।

হাঁপানি আক্রমণের জন্য দায়ী উত্তেজক বস্তুসমূহ

- ধুলা বালি
- ফুলের রেণু
- বসন্ত কালে ঘাসে ঢাকা মাঠ
- বালিশের তুলা, পালক, লেপ/কাঁথার আশ
- পশুর চুল ও লোম
- কার্পেট
- কাঁচা রঙের গন্ধ
- ধুলাবাহী পোকামাকড় (যেমন হাউস ডাষ্ট মাইট)
- ঔষধ (ব্যথা নিরোধক ঔষধ)
- ঠান্ডা দুধ
- ধুমপান
- কোলা জাতীয় পানীয়
- ঠান্ডা শুষ্ক বাতাস
- উত্তেজনা/দুশ্চিন্তা
- যাদের ঠান্ডা বা সর্দি লেগেছে তাদের সংস্পর্শ ।

হাঁপানির কারণ

হাঁপানিতে আক্রান্ত মানুষের শ্বাসনালী সাধারণত সব সময়ই প্রদাহে লাল হয়ে থাকে ও ক্ষত পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষতিগ্রস্থ শ্বাসনালী বিভিন্ন প্রকার সাধারণ উত্তেজক এর প্রতি খুবই স্পর্শকাতর। এটা কোন সংক্রামক ব্যাধি, স্নায়ুবিক ব্যাধি নয়, যদিও মানসিক আবেগে ও উৎকণ্ঠা কখনও কিছু কিছু উপসর্গ (কাশি, শ্বাসকষ্ট) দেখা যায়।

উপশম

প্রাথমিকভাবে শ্বাসকষ্ট উপশমের জন্য বয়স ও মাত্রানুযায়ী সালবিউটামল, থিওফাইলিন বা এমাইনোফাইলিন ট্যাবলেট/সিরাপ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

প্রতিরোধ

- মুক্ত বাতাসে থাকার চেষ্টা করতে হবে
- যেসব জিনিসের সংস্পর্শে আসলে হাঁপানি বেড়ে যায় তা থেকে দূরে থাকতে হবে
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে
- ধুমপান বর্জন করতে হবে
- অনেক দিন যাবত অব্যবহৃত কাপড়-চোপড়ে এ মাইট জন্মে অতএব এগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে ভালভাবে শুকিয়ে এবং সম্ভব হলে ইস্ত্রী করে ব্যবহার করতে হবে
- ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- যে সকল খাবারে এলার্জি আছে তা পরিহার করতে হবে।

জটিলতা

অনেক দিন যাবত হাঁপানি থাকলে তাতে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যায় ফলে হৃৎপিন্ডের মারাত্মক রোগ হতে পারে। যেমন- হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)।

পাঠ- ১৭

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension)

ইং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১.	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২.	উচ্চ রক্তচাপ: কারণ, জটিলতা, ঝুঁকি ও চিকিৎসা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মিঃ
৩.	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

স্বাভাবিক রক্তচাপ বলতে বোঝায় সেই বল, যার সাহায্যে রক্ত শরীরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পোঁছায় । হৃদপিন্ডের পাম্পিং ক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তচাপ তৈরী হয় । রক্তচাপের একক কোন মাত্রা নেই । বিভিন্ন বয়সের সাথে সাথে একেক জন মানুষের শরীরে রক্তচাপের মাত্রা ভিন্ন এবং একই মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে স্বাভাবিক এই রক্তচাপও বিভিন্ন রকম হতে পারে । উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, অধিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে । ঘুমের সময় এবং বিশ্রাম নিলে রক্তচাপ কমে যায় । রক্তচাপের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে । অধিকাংশ সময় রক্তচাপের মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার ভিতরেই থাকে । সাধারনত বয়স যত কম, রক্তচাপও তত কম হয় । যদি কারও রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার চাইতে বেশী হয় এবং অধিকাংশ সময়, এমনকি বিশ্রাম কালীনও বেশী থাকে, তবে ধরে নিতে হবে তিনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী ।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি.মি. মারকারীর কম অর্থাৎ সিসটেলিক প্রেসার ১৪০ মি.মি. ও ডায়ষ্টলিক প্রেসার ৯০ মি.মি.মারকারীর কম থাকে । যদি সিসটেলিক প্রেসার ১৪০ মি মি ও ডায়ষ্টলিক প্রেসার ৯০ মি.মি. মারকারীর এর বেশি হয় তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয় ।

উচ্চ রক্তচাপ কি আসলেই জটিল ব্যাধি ?

উচ্চ রক্তচাপ ভয়ংকর পরিনতি ডেকে আনতে পারে । অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপের কোন প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায় না । এটাই উচ্চ রক্তচাপের সবচাইতে ভীতিকর দিক । যদিও অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপের রোগীর বেলায় কোন লক্ষণ থাকে না, তবুও নিরবে উচ্চ রক্তচাপ শরীরের বিভিন্ন অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । এ জন্যই উচ্চ রক্তচাপকে "নিরব ঘাতক" বলা যেতে পারে । অনিয়ন্ত্রিত এবং চিকিৎসা বিহীন উচ্চ রক্তচাপ থেকে মারাত্মক শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন স্ট্রোক ।

উচ্চ রক্তচাপ হলে কি কি জটিলতা হতে পারে?

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত না থাকলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ৪টি অঙ্গে মারাত্মক ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে । যেমন- হৃদপিন্ড, কিডনি, মস্তিস্ক ও চোখ । অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদযন্ত্রের মাংশপেশী দুর্বল হয়ে যেতে পারে । দুর্বল হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করতে পারে না এবং এই অবস্থাকে বলা হয় হার্ট ফেইলিওর । রক্তনালির গাত্র সংকুচিত হয়ে হার্ট এ্যাটাক বা ইনর্ফাকশন হতে পারে । উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনী নষ্ট হয়ে রেনাল ফেইল্যুর, মস্তিস্কে স্ট্রোক হতে পারে যা থেকে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে । এছাড়া চোখের রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়ে অন্ধত্ব বরণ করতে পারে ।

কি কি কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয়?

৯০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোন নির্দিষ্ঠ কারণ জানা যায় না, একে প্রাইমারী বা এসেন্সিয়াল রক্তচাপ বলে । সাধারণত বয়স্ক মানুষের উচ্চ রক্তচাপ বেশী হয়ে থাকে । কিছু কিছু বিষয় উচ্চ রক্তচাপর সম্ভাবনা বাড়ায়, যাহা নিম্নরুপ-

- **বংশানুক্রমিক ঃ** উচ্চ রক্তচাপের বংশগত ধারাবাহিকতা আছে, যদি বাবা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকে তবে সন্তানেরও উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এমনকি নিকটাত্মীয়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অন্যদের রক্তচাপের ঝুঁকি থাকে ।
- **ধুমপান ঃ** ধুমপায়ীদের শরীরে তামাকের নানা রকম বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চ রক্তচাপসহ ধমনী, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে ।
- **অতিরিক্ত লবন গ্রহণ ঃ** খাবার লবনে সোডিয়াম থাকে যা রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয় । ফলে রক্তের আয়োতন বেড়ে যায় এবং রক্ত চাপও বেড়ে যায় ।

- **অধিক ওজন এবং অলস জীবনযাত্রা ঃ** যথেষ্ঠ পরিমাণে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম না করলে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং এর ফলে অধিক ওজন সম্পন্ন লোকদের উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে।
- **অস্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস ঃ** অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার, যেমন মাংস, মাখন এবং ডুবা তেলে ভাজা খাবার খেলে ওজন বাড়বে। ডিমের হলুদ অংশ এবং কলিজা, গুর্দা, মগজ এসব খেলে রক্তে কোলেস্টারল বেড়ে যায়। রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টারল হলে রক্তণালীর দেয়াল মোটা ও শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।
- **অতিরিক্ত মদ্যপান ঃ** যারা নিয়মিত অত্যাধিক পরিমাণে মদ্যপান করে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ বেশি হয়। অ্যালকোহলে অতিরিক্ত ক্যালরী থাকে, এর ফলে ওজন বেড়ে যায় এবং এতে রক্তচাপ বেড়ে যায়।
- **ডায়াবেটিস ঃ** ডায়াবেটিস রোগীদের অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস বেশী হয়। ফলে বয়সের সাথে সাথে ডায়াবেটিস রোগীদের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। এছাড়া তাদের অন্ধত্ব ও কিডনীর নানা রকম রোগ হতে পারে।
- **অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা ঃ** অতিরিক্ত রাগ, উত্তেজনা, ভীতি বা মানসিক চাপের কারণেও রক্তচাপ সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে। যদি এই মানসিক চাপ অব্যাহত থাকে এবং রোগী ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারেন, তবে এই উচ্চ রক্তচাপ স্থায়ী রুপ নিতে পারে।

কিছু কিছু রোগের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে একে বলা হয় সেকেন্ডারী হাইপারটেনশন। এই কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো-

- কিডনীর রোগ।
- অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ও পিটুইটারী গ্রন্থির টিউমার।
- ধমনীর বংশগত রোগ।
- গর্ভধারণ অবস্থায় এ্যাকলাম্পসিয়া ও প্রিএ্যাকলাম্পসিয়া হলে।
- অনেক দিন ধরে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ির ব্যবহার, স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ গ্রহণ এবং ব্যাথা নিরামক কিছু কিছু ঔষধ খেলে।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে কি করা উচিৎ ?

জীবন যাত্রার পরিবর্তন এনে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। বংশগতভাবে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমানো সম্ভব না। তবে এরকম ক্ষেত্রে যে সব উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেগুলোর ব্যাপারে বেশী মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

- **অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে ঃ** খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও নিয়মত ব্যায়াম করতে হবে। একবার লক্ষ্য অনুযায়ী ওজনে পৌছালে সীমিত আহার করা উচিত এবং ব্যায়াম অব্যাহত রাখতে হবে। ঔষধ খেয়ে ওজন কমানো বিপদজনক। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওজন কমানোর ঔষধ না খাওয়াই ভালো।

- **খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ঃ** কম চর্বি ও কম কোলেস্টারল যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন খাসি বা গরুর গোস্ত, কলিজা, মগজ, গিলা, গুর্দা, ডিম কম খেতে হবে। কম তেলে রান্না করা খাবার এবং ননী তোলা দুধ, অসম্পৃক্ত চর্বি যেমন সয়াবিন, ক্যানোলা, ভুট্টার তেল অথবা সূর্য্যমুখীর তেল খাওয়া যাবে। বেশী আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো। আটার রুটি এবং সুজী জাতীয় খাবার পরিমাণ মতো খাওয়া ভালো।

- **লবণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** তরকারীতে প্রয়োজনীয় লবণের বাইরে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে।

- **মদ্যপান ঃ** অতিরিক্ত মদ্যপান পরিহার করতে হবে।

- **নিয়মিত ব্যায়াম ঃ** সকাল সন্ধ্যা হাঁটাচলা, সম্ভব হলে দৌড়ানো, হালকা ব্যায়াম, লিফটে না চড়ে সিঁড়ি ব্যবহার ইত্যাদি।

- **ধুমপান বর্জন ঃ** ধুমপান অবশ্যই বর্জনীয়। ধুমপায়ীর সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকুন। তামাক পাতা, জর্দা, গুল লাগানো ইত্যাদিও পরিহার করতে হবে।

- **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ঃ** যাদের ডায়াবেটিস আছে, তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

- **মানসিক ও শারীরিক চাপ সামলাতে হবে ঃ** নিয়মিত বিশ্রাম, সময় মতো ঘুমানো, শরীরকে অতিরিক্ত ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দিতে হবে। নিজের সখের কাজ করা, নিজ ধর্মের চর্চা করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক শান্তি বেশী হবে।

- **রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা ঃ** নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে রক্তচাপ পরীক্ষা করানো উচিৎ। যত আগে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে, তত আগে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং জটিল রোগ বা প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপ হলে কি চিকিৎসা করাতেই হবে?

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় হয় না (সারে না); একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর জন্য নিয়মিত ঔষধপত্র সেবন করতে হবে। অনেক রোগী কিছুদিন ঔষধ খাবার পর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসলে ঔষধ বন্ধ করে দেন, মনে করেন রক্তচাপ ভাল হয়ে গেছে, কাজেই ঔষধ খাওয়ার দরকার কি? এই ধারণা ভুল।

কোন ক্রমেই ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া ঔষধ সেবন বন্ধ করা যাবে না। অনেকেই আবার উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত জানার পরও ঔষধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেন বা খেতে চান না। কারো কারো ধারণা, একবার ঔষধ খেলে তা আর বন্ধ করা যাবে না।

আবার কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে, উচ্চ রক্তচাপ তার দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে কোন সমস্যা করছে না বা রোগের কোন লক্ষণ নাই, তাই উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ খেতে চান না বা প্রয়েজন মনে করেন না। মনে করেন ভালোইতো আছি, ঔষধের কি দরকার? এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। এই ধরনের রোগীরাই হঠাৎ করে হৃদরোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, এমন কি মৃত্যুও হয়ে থাকে। তাদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে এবং নিয়মিত চেক করতে হবে।

পাঠ- ১৮

ক্যান্সার (Cancer)

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১.	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২.	ক্যান্সারঃ কী, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মিঃ
৩.	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক।	১০ মিঃ

দিন দিন অসংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা বেড়েই চলছে, ক্যান্সার তার মধ্যে অন্যতম। ক্যান্সার শব্দটি শুনলে যে কেউ আঁতকে উঠেন। অনেকের দৃষ্টিতে ক্যান্সার এক ভয়ানক ব্যধি, ক্যান্সার মানেই মৃত্যুদন্ড। এক সময় মনে করা হতো, ক্যান্সারের কোন এন্সার (উত্তর) নাই। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে এই ধারনা গুলো আর মোটেই সত্য নয়, ক্যান্সারের নিরাময় সম্ভব। শুধু দরকার সময় মত সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা গ্রহণ করা।

ক্যান্সার বলতে সাধারণভাবে জীব কোষের অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই বোঝায়। এই কোষগুলো স্বাভাবিক নয়, বরং পরিবর্তিত বিধায় দেহের সাধারণ নিয়মে এদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে খুব দ্রুত এইসব কোষের পরিমাণ বাড়তে পারে, কখনো কখনো এগুলো টিউমার বা চাকার মত তৈরী করে এবং এক পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই অস্বাভাবিক কোষগুলো সুস্থ স্বাভাবিক কোষ গুলোকে ধ্বংস করে ও শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো ধীরে ধীরে দেহের প্রয়োজনীয় অংগ গুলোকে অকেজো করে দেয় এবং রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ক্যান্সার যে কোন বয়সেই হতে পারে, কিছু কিছু ক্যান্সার অল্প বয়সেই হয়, তবে সাধারণত বয়স্কদের মধ্যেই ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বেশী। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির মধ্যেও ক্যান্সারের পুরোপুরি কারণ এখনও জানা নাই। কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক, পেশা, এমনকি জীবন যাত্রার পদ্ধতি বা কু-অভ্যাস ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ-

- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধুমপান
- দীর্ঘদিন মদ্যপানের অভ্যাস
- খাদ্যভাস যেমন খাদ্যে ফাইবারের অভাব, ভিটামিন বা এন্টি-অক্সিডেন্টের অভাব
- প্রিজারভেটিভ, কেমিক্যাল বা রঙ যুক্ত খাবার
- আর্সেনিকযুক্ত পানি পান
- পরিবেশ দুষণ এবং কেমিক্যালের সংস্পর্শে আসা
- বিভিন্ন ধরনের বিকিরন (যেমন- সূর্যরশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি, এক্স-রে, কসমিক-রে ইত্যাদি)
- কর্মস্থল বা পেশাগত কারণে অনেকের ক্যান্সার হতে পারে, যেমন রেডিয়েশন বা কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করা, অনেকক্ষণ রোদ্রে থেকে কাজ করা, জাহাজ ভাঙ্গার শ্রমিক, রঙ ও রাবার কারখানার কর্মী ইত্যাদি
- বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্যান্য জীবাণুর দ্বারা সংক্রমনের ফলে ক্যান্সার হতে পারে, যেমন- হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এপস্টিন বার ভাইরাস, হ্যালিকোব্যাক্টর পাইলোরি, হেপাটাইটিস-বি এবং সি ভাইরাস, এইচআইভি ভাইরাস ইত্যাদি। সিস্টোসোমা জাতীয় জীবাণু মধ্যপ্রাচ্য বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মূত্রাশয় ক্যান্সারের কারণ হিসেবে বিবেচিত
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন বা স্থূলতা
- কিছু কিছু ঔষধ বা চিকিৎসা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে
- অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক, একাধিক যৌন সঙ্গী, পেশাদার যৌন কর্মীর সাথে যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি
- ক্রোমোজম বা জিনের কারণেও ক্যান্সার হতে পারে।

ক্যান্সারের লক্ষণ নির্ভর করে কোথায় কি ধরনের ক্যানাসার হয়েছে তার উপরে। অনেক ক্ষেত্রেই কোন লক্ষণই থাকে না। দেখা গেছে যে, ক্যান্সার ছড়িয়ে যাওয়ার পরেই তা ধরা পড়ে। তারপরও কিছু কিছু লক্ষণ বা উপসর্গ থাকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত-

- সুস্থ ছিলেন, হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া
- অরুচি বা ক্ষুদামন্দা

- অতিরিক্ত দুর্বলতা, রক্তস্বল্পতা, দাঁতের গোড়ায় বা নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ, চামড়ার নিচে জমাট রক্ত ইত্যাদি
- শরীরে কোথাও চাকা বা গোটা দেখা দিলে, বিশেষ করে গলায়, বগলে, কুঁচকিতে, পেটে বা মহিলাদের স্তনে
- দীর্ঘদিন জ্বর থাকলে, বিশেষ করে যদি রাতের বেলা প্রচুর ঘাম দেয়
- অনেক দিনের কাশি বা সাধারণ চিকিৎসায় ভাল হচ্ছে না, বিশেষ করে বয়স্কদের বেলায় এবং কাশির সাথে রক্ত আসলে
- গলার স্বর ভেঙ্গে গেলে বা কাশির সাথে গলার স্বরের পরিবর্তন হলে
- বয়স্কদের প্রস্রাব করতে সমস্যা হলে বা পায়খানার সাথে রক্ত গেলে
- পায়খানার অভ্যাস পরিবর্তন হলে বা পায়খানার সাথে রক্ত গেলে
- খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যাথা
- বদহজম, দীর্ঘদিনের পেটে ব্যাথা বা রক্তবমি
- মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের পরিবর্তন হওয়া, যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের আবার রক্ত ক্ষরণ হওয়া
- মাথা ব্যাথা, খিঁচুনি, জ্ঞান হারানো, হঠাৎ বমি করা ইত্যাদি
- চামড়ায় নতুন করে রঙের পরিবর্তন, তিলের আকার বা গড়ন পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদি ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, এ সমস্ত লক্ষণ অন্য বিভিন্ন রোগের কারণেও হতে পারে । তাই এগুলো হলেই ক্যান্সার হয়েছে ভেবে কেউ যেন অযথা আতংকগ্রস্থ না হয়ে পড়েন ।

অনেক ক্যান্সারই সময়মত চিকিৎসায় নিরাময় যোগ্য । ক্যান্সারের প্রকার ভেদে, কতটুকু ছড়িয়ে গেছে, কি কি সমস্যা করছে, রোগীর বয়স কত, আর শারীরিক অবস্থা কেমন- এসবের উপর ভিত্তি করে ক্যান্সারের নানা রকমের চিকিৎসা দেয়া হয় । এ জন্য চিকিৎসার আগেই বায়োপসি, টিস্যু পরীক্ষা, নানা রকমের স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি করা হয় । আবার অনেক ক্যান্সার চিকিৎসায় ভাল অথবা ছড়িয়ে গেলে চিকিৎসা করার আর উপায় থাকে না । সবচেয়ে বড় কথা ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় বহুল এবং দরিদ্র রোগীদের নাগালের বাইরে । এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও অনেক বেশী । তাই চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম ।

ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের যা যা করতে হবে তা হল, জীবন যাপনে পরিবর্তন এনে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানো । অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ক্যান্সারের এক তৃতীয়াংশ কারণ জীবন যাপনের সঙ্গে জড়িত, যা অনেকে ইচ্ছা করলেই নিয়ন্ত্রন করে ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়াতে পারেন ।

নিচের কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত-

- ধুমপানসহ তামাকের যে কোন ধরনের ব্যবহার পরিহার করা
- মদ্যপান পরিহার করা
- শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণসহ অন্য যে কোন নেশা পরিহার করা
- সঠিক খাদ্যভাস- সুষম খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ (ফাইবার) ও এন্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খাওয়া, চর্বি জাতীয় ও তৈলাক্ত খাবার কম খাওয়া, প্রিজারভেটিভ বা কেমিক্যাল যুক্ত খাবার বর্জন, ফাস্ট ফুড ও কোমল পানীয় বর্জন ইত্যাদি
- আর্সেনিকমুক্ত পানি পান
- শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলা, এজন্য নিয়মিত হাটাচলা, ব্যায়াম এবং সাথে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা
- দীর্ঘসময় সরাসরি সূর্যের নীচে না থাকা, প্রয়োজণে ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করা
- যৌনাভ্যাসের ক্ষেত্রে সামাজিক নৈতিকতা মেনে চলা, বহু যৌনসঙ্গী বা পেশাদার যৌন কর্মীর সাথে যৌনকর্ম এবং অস্বাভাবিক যৌনাচার পরিহার করা
- রক্তদান বা গ্রহণ অথবা যে কোন ইনজেকশন গ্রহণের সময় এবং এন্ডোস্কপি, কলোনোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা
- বেশ কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা নিয়ে ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব, যেমন হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকা ইত্যাদি
- যেসব জীবাণু ক্যান্সার তৈরী করতে পারে, তা শরীরে ধরা পড়া মাত্র চিকিৎসা করে ফেলা
- কর্মক্ষেত্রে ক্যান্সার তৈরীকারী রেডিয়েশন বা কেমিক্যালের সংস্পর্শ পরিহার করা

- সন্দেহজনক যে কোন উপসর্গ যেমন চাকা বা গোটা, ক্ষত, তিলের রঙ পরিবর্তন, দীর্ঘ দিনের জ্বর ইত্যাদি দেখা দিলে অবহেলা না করা ।

পাঠ- ১৯

পেপটিক আলসার (Peptic Ulcer)

নং	আপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মিঃ)
১.	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মিঃ
২.	পেপটিক আলসার: কারণ, জটিলতা ও চিকিৎসা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মিঃ
৩.	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মিঃ

পাকস্থলী (Stomach) বা খাদ্য থলিতে এ রোগের সৃষ্টি হয় । দীর্ঘদিন পাকস্থলীতে প্রদাহ বা ব্যথায় ভুগতে থাকলে পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লীর (Mucous membrane) কর্মক্ষমতা এবং প্রতিরক্ষার ক্ষমতা কমে যায় । ফলে পাকস্থলীর পাচক রসের পেপসিনের অম্ল ও হাইডোক্লোরিক অম্ল (Acid) পাকস্থলী পাত্রের মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে । কখনও কখনও এ ক্ষত শুকিয়ে যেতেও পারে আবার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতেও পরিণত হতে পারে । এ ক্ষতই পেপটিক আলসার ।

প্রাথমিক অবস্থায় সুচিকিৎসা হলে পেপটিক আলসার অল্প সময়েই সেরে উঠে । আবার অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, নেশা জাতীয় পানীয় গ্রহণ ও উত্তেজক খাদ্যগ্রহণে এ রোগ বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক ও জটিলতা সৃষ্টি করে । পাকস্থলীর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা ঝিল্লী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীতে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় থাকে না । ডিওডেনাল আলসার ও গ্যাষ্টিক আলসার সঠিকভাবে কোনটিই প্রমানিত না হলে পেপটিক আলসার বলে ধারণা করা হয় ।

ক্ষতের স্থান ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে পরিপাক তন্ত্রের যে কোন ক্ষতকে পেপটিক আলসার বলে । যেমন-

১ । খাদ্য নালীর ক্ষত
২ । পাকস্থলীর ক্ষত
৩ । ডিওডেনামের ক্ষত
৪ । জেজুনামের ক্ষত

মূলতঃ পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ক্ষতকেই পেপটিক আলসার ধরা হয় ।

পেপটিক আলসারের জটিলতা সমূহ

১ । খাদ্যনালীর শেষ প্রান্তের সংকোচন (Pyloric Stenosis)
২ । পেরিগ্যাষ্টিক ফোঁড়া (Perigastric Abscess)
৩ । নাড়ীছিদ্র (Perforation)
৪ । রক্ত বমি ও রক্ত মল (Haematemesis and Malaena)
৫ । কর্কটরোগ বা ক্যান্সার (Cancer) ।

লক্ষণ

- ক্ষুধার ভাব ও ক্ষুধা লাগলেও রোগী ব্যাথার ভয়ে খেতে চায় না
- খালি পেটে ব্যাথা বাড়ে খেলে ব্যাথা কমে যায় (ডিওডেলাল আলসার)
- খাবার পর ব্যাথা বাড়ে এবং ১/২ ঘন্টা পর ব্যাথার তীব্রতা বাড়তে থাকে । কিছু সময় পরে ব্যাথা আপনা আপনিই কমে যায় (গ্যাস্টিক আলসার)
- রোগী গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে এবং পেট খালি রাখতে পছন্দ করে
- সুই দিয়ে খোচানোর মত ব্যাথা হয় । নাভীর একটু উপরের দিকে এবং বাম দিকে ব্যাথা অনুভূত হয়
- কখনও কখনও এ ব্যাথা পিঠের দিকে যেতে পারে এবং ঢেকুর উঠে
- ব্যাথা বৃদ্ধির সাথে বমিও বেড়ে যায় । অম্লপিত্ত ও অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বের হয়ে আসে
- বুক জ্বালা করে এবং দাঁত ও মুখে টক ভাব থাকে
- রোগী উপুড় হয়ে পেটের নীচে বালিশ চাপ দিয়ে শুলে এবং পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পেটের উপর মালিশ করলে সাময়িক সময়ের জন্য আরাম বোধ করে

- ব্যাথার স্থানে চাপ দিলে ব্যাথা বেশী হয় এবং ব্যাথা বৃদ্ধির সাথে পেটে মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে শক্ত ও কঠিন ভাব হয়
- খাওয়ার সোডা (Sodi-bi-Carb) খেলে ব্যাথা কিছুটা কমে
- রোগীর নিদ্রা হয় না এবং দিনে দিনে রোগী দুর্বল ও পুষ্টিহীনতার শিকার হয়; চিন্তিত হয়ে পড়ে
- অতিরিক্ত ব্যাথায় বা নাড়ি ছিদ্র (Perforation) হলে রক্ত বমি ও রক্ত মল বের হয়ে রোগীর রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়
- রোগীর শরীরে জ্বর থাকে এবং পাতলা পায়খানা করে ।

চিকিৎসা

১। এন্টাসিড ট্যাবলেট বা সিরাপ
২। ব্যাথা বেশী হলে Hyoscine-N- butyle bromide (Hysomide) ট্যাবলেট দিতে হবে
৩। H_2 রিসিপ্টর ব্লকার, যেমন-রেনিটিডিন
৪। PPI (প্রোটোন পাম্প ইন্‌হিবিটর্) হিসেবে ওমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল, এসোমিপ্রাজল, রেবিপ্রাজল ব্যবহার করা যেতে পারে ।

উপরোক্ত চিকিৎসার পর উন্নতি না হলে চিকিৎকের নিকট অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

পাঠ- ২০

বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

নং	ধাপ	পদ্ধতি	সময় (৬০ মি:)
১.	কুশল বিনিময়, অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই	উপস্থাপনা ও আলোচনা	১০ মি:
২.	উহুমূত্র রোগ: প্রকারভেদ, কারণ, লক্ষণ, ঝুঁকি, নির্ণয়ের উপায়, ঝুঁকি ও চিকিৎসা ।	শ্রেণীকক্ষ পাঠ, উপস্থাপনা ও আলোচনা	৪০ মি:
৩.	ধন্যবাদ সহকারে সেশন মূল্যায়ন	প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ফিডব্যাক ।	১০ মি:

ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা বহুমূত্র রোগ হলো একটি বিপাক জনিত সমস্যা যেখানে রক্তের গ্লুকোজ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। বংশগত অথবা পারিপার্শ্বিক কারণে ইনসুলিন নামক হরমোন নি:সরণ কমে গেলে, বা ইনসুলিনের কার্য ক্ষমতা কমে গেলে, বা এ দুয়ের মিলিত প্রভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা বিভিন্ন সরল উপাদানে পরিবর্তিত হয়, যার একটি হলো গ্লুকোজ । গ্লুকোজ প্রধানত শর্করা জাতীয় খাবার থেকে আসে এবং রক্তের মধ্যমে শরীরের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয় । কোষের শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্লুকোজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মানবদেহের অগ্নাশয় নামক গ্রন্থিও বিটা কোষ থেকে তৈরী হওয়া হরমোন ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহারে সহায়তা করে । ইনসুলিনের নি:সরণ কমে গেলে, অথবা ইনসুলিনের কার্য ক্ষমতা কমে গেলে, শরীর ঠিকমত গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারে না, ফলে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায়; এই অবস্থাই ডায়াবেটিস মেলাইটাস ।

ডায়বেটিসের প্রকারভেদ

- টাইপ-১ ডায়াবেটিস
- টাইপ-২ ডায়াবেটিস
- অন্যান্য বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ।

টাইপ-১ ডায়াবেটিস

সাধারণত ৩০ বৎসরের কম বয়সীদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস হলেও যে কোন বয়সের লোকই এ ধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে । বিশ্বের মোট ডায়াবেটিক জনগোষ্ঠীর ৫-১০% এ ধরনের ডায়াবেটিসে ভোগে । এতে ভাইরাস সংক্রমণ বা অন্য কোন অজানা কারণে অগ্নাশয়ের ইনসুলিন নিঃসরনকারী বিটা কোষগুলোর বিপরীতে এন্টিবডি তৈরী হয় এবং কোষগুলো দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে । এক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দেহে ইনসুলিন উৎপাদন করার মত বিটা কোষই থাকে না । আর তাই বেঁচে থাকার জন্য এদের বাইরে থেকে ইনসুলিন দেয়া অত্যাবশ্যক । এরা খুব দ্রুত আক্রান্ত হওয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডায়াবেটিসের উপসর্গ দেখা দেয় । টাইপ-১ ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের ওজন সাধারণত কম হয়ে থাকে ।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস

বিশ্বের বেশীরভাগ ডায়াবেটিক ব্যক্তিই টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় । এদের শরীরে ইনসুলিনের অভাবের পাশপাশি ইনসুলিন ঠিকমত কাজ করতে না পারা (Insulin resitance) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । সাধারণত ৩০ বৎসরের অধিক বয়সী ব্যক্তিদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হয়ে থাকলেও কখনও কখনও অল্প বয়সেও হতে পারে । এরা ধীরে ধীরে আক্রান্ত হওয়ায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গ সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না । টাইপ-২ ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের ওজন সাধারণত বেশী হয়ে থাকে । জীবন-যাত্রার পরিবর্তন ও খাবার বড়ি দিয়ে এদের চিকিৎসা করা যেতে পারে ।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকিগুলো হল

- বয়স বেশী হলে
- নিকট আত্নীয় কারো ডায়াবেটিস থাকলে
- স্থূলতা বা অত্যাধিক ওজন হলে
- কায়িক শ্রমহীন জীবনযাপন করলে

- গর্ভকালীন অপুষ্টি (ভবিষ্যতে সন্তানের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়)।

অন্যান্য বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস

কোন কোন ঔষধ দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে অথবা কোন হরমোন জনিত সমস্যার কারণে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায়। এ ধরনের ডায়াবেটিসের ভিতর উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

- হরমোন রোগ- Cushing's syndrome, Thyrotoxicosis, Acromegaly ইত্যাদি
- ঔষধ- ষ্টেরয়েড জাতীয়
- অগ্নাশয়ের রোগ- অগ্নাশয়ের পাথর ও প্রদাহ ইত্যাদি।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে গেলে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলে।

ডায়াবেটিসের উপসর্গ

টাইপ-২ ডায়াবেটিস দীর্ঘকাল কোন রকমের লক্ষণ ছাড়াই মানুষের শরীরে বসবাস করতে পারে। শতকরা ৫০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রথমবারের মত নির্ণীত হবার সময়ই দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাসমূহ দেখা যায়।

ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো হলো -

- ঘন ঘন প্রস্রাব
- অত্যাধিক পিপাসা
- অত্যাধিক ক্ষুধা
- ওজন কমে যাওয়া
- দুর্বলতা
- এছাড়া বারবার মূত্রনালীর সংক্রমণ, চর্মরোগ, ঘা ও ফোঁড়া, ক্ষত না শুকানো, মেয়েদের বন্ধ্যাত্ব , গর্ভপাত, মৃত শিশু জন্ম দেয়া ইত্যাদি উপসর্গও দেখা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস নির্ণয়ের উপায়-

Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)

ডায়াবেটিস নির্ণয়ের আদর্শ পরীক্ষা। OGTT করার জন্য অন্তত ৩ দিন স্বাভাবিক শর্করাসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পর সারারাত না খেয়ে এবং পূর্ণ বিশ্রাম শেষে সকাল বেলা খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ (FBG) পরীক্ষা করা হয়। অত:পর ২৫০-৩০০ মিলি পানিতে ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ মিশিয়ে খাওয়ানোর ২ঘন্টা পর পুনরায় রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা হয়।

	অভুক্ত অবস্থায় রক্তের গ্লুকোজ (FBG)	গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘন্টা পর রক্তের গ্লুকোজ (2hr AG)
Normal (স্বাভাবিক)	< ৬.১ মি.মোল/লি	< ৭.৮ মি.মোল/লি
IFG (Impaired Fasting Glucose)	৬.১ থেকে <৭.০ মি.মোল/লি	<৭.৮ মি.মোল/লি
IGT (Impaired Glucose Tolerance)	< ৭.০ মি.মোল/লি	৭.৮ থেকে < ১১.১ মি.মোল/লি
DM (Diabetes Mellitus)	≤৭.০ মি.মোল/লি	≤ ১১.১ মি.মোল/লি

গ্লুকোজ রিপোর্টে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রার উপর নিম্নে চার্ট অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে Normal, IFG, IGT বা DM হিসেবে সনাক্ত হয়ে থাকে।

Fasting Blood Glucose (FBG)

সাধারণত (৮-১৪ ঘন্টা) অভূক্ত থেকে সকালে খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ (FBG) পরীক্ষা করে কখনো কখনো একজন ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে কিনা নিশ্চিত করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে OGTT-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়।

Random Blood Glucose (RBG)

দিনের যে কোন সময়ের রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা (RBG) অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ডায়াবেটিস সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যেতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই OGTT- এর মাধ্যমে নিশ্চেত করা জরুরী। ডায়াবেটিসের উপসর্গ এবং এর সাথে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা (RBG) >১১.১ মি মোল/লি হলে ডায়াবেটিস নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা (Pre-diabetes)

এ সকল ব্যক্তির রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী কিন্তু ডায়াবেটিসের নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকে। IFG এবং IGT এই শ্রেণীভূক্ত। পরবর্তী সময়ে এদের ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলো হলো ঃ

- জীবন যাত্রার পরিবর্তন
    - খাদ্য ব্যবস্থা
    - ব্যায়াম
- ঔষধ, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে (টাইপ-১ এর ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনসুলিন প্রযোজ্য)।

ডায়াবেটিস চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হলো

- রোগীকে উপসর্গমুক্ত করা
- রোগীর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা প্রতিরোধ করা
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিষয়, যেমন কোন জরুরী অবস্থা/ অসুস্থতার সময় করণীয় কি, পায়ের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা

অভুক্ত অবস্থায় রক্তের গ্লুকোজ	(৬.০ $\pm$ ১.০) মি.মোল/লি
খাবার ২ ঘন্টা পর রক্তের গ্লুকোজ	(৮.০ $\pm$ ২.০) মি.মোল/লি
HbA1c	৬.৫-৭.০%
এল.ডি.এল (LDL)	১০০ মি.গ্রাম/ডিএল এর নীচে
এইচ.ডি.এল (HDL)	৪০ মি.গ্রাম/ডিএল (পুরুষ) এবং ৫০ মি.গ্রাম/ডিএল (মহিলা) এর উপরে
ট্রাইগ্লিসারাইড (TG)	১৫০ মি.গ্রাম/ডিএল এর নীচে
বেজাল মেটাবোলিক ইনডেক্স (BMI)	২৩ কেজি/মি^{২} এর নীচে
রক্তচাপ	১৪০/৮০ মি.মি অফ মার্কারী এর নীচে

যাদের ক্ষেত্রে খুব সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ততটা জরুরী নয়

- খুব অল্প বয়স্ক শিশু
- অনেক বয়স্ক ব্যক্তি
- যাদের অন্যান্য বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা আছে, যেমন ক্যান্সার, জটিল হৃদরোগ ইত্যাদি
- বারবার 'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' হলে।

ডায়াবেটিসে খাদ্য ব্যবস্থা

খাদ্য ব্যবস্থা মানে কখনই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নয়। বরং স্বাস্থ্যসন্মত সুষম খাদ্য নিশ্চিত করাই খাদ্য ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য, যেখানে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান (শর্করা, আমিষ, চর্বি, আঁশজাতীয় খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ লবন ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে।

খাদ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো

- সুষম খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা
- আদর্শ ওজন ধরে রাখা
- রক্তের গ্লুকোজ ও চর্বির মাত্রা স্বাভাবিক রাখা
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা
- গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালীন সময়ে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা ।

শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)

শর্করা জাতীয় খাবারগুলোকে মূলতঃ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

- **সরল শর্করা-** চিনি, গ্লুকোজ, কোমল পানীয়, জ্যাম, জেলী, মধু, মিষ্টি, কেক, চকোলেট ইত্যাদি । এ ধরনের শর্করা খুব তাড়াতাড়ি পরিপাক ও শোষিত হয় বলে রক্তের গ্লুকোজ হঠাৎ করে খুব বেশী বেড়ে যায়; তাই ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের এগুলো পরিহার করা ভালো ।
- **জটিল শর্করা-** ভাত, রুটি, গম, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি । এ জাতীয় শর্করা ধীরে ধীরে পরিপাক ও শোষিত হয় বলে রক্তের গ্লুকোজ হঠাৎ করে খুব বেশী বাড়ে না; তাই ডায়াবেটিক ব্যক্তির শর্করার উপাদান হিসেবে এগুলো গ্রহণ করা ভালো ।

আমিষ (প্রোটিন)

আমিষ জাতীয় খাদ্য শরীর গঠন করার পাশাপাশি রক্তকোষ, হরমোন ইত্যাদি তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের অবশ্যই পর্যাপ্ত আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ। আমিষ জাতীয় খাদ্যের ভিতর প্রাণীজ আমিষ অধিকতর ভালো আমিষ বলে বিবেচিত যা ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি হতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে উদ্ভিজ্জ আমিষ আসে ডাল, বাদাম ইত্যাদি হতে ।

চর্বি (ফ্যাট)

খাদ্যের সবচেয়ে অধিক ক্যালরী সম্মৃদ্ধ উপাদান হলো চর্বি। সম্পৃক্ত চর্বি অতিরিক্ত গ্রহণ করলে রক্তের চর্বিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং হৃদরোগ ও ষ্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। যে সব চর্বি জাতীয় খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জমে যায় সেগুলো সম্পৃক্ত চর্বি, যেমন ঘি, মাখন, নারকেল তেল, পাম তেল ইত্যাদি ।

আঁশ জাতীয় খাদ্য (ফাইব্রাস ফুড)

খাদ্যে আঁশের প্রধান উৎস হলো গম, ফল, সব্জি, আলু। আঁশ জাতীয় খাবারের উপকারীতা হলো- গ্লুকোজের শোষণ মন্থর করা, খাদ্যের চর্বির শোষণ কমিয়ে দেয়া, দেহের ওজন নিয়ন্ত্রিত রাখা, পায়খানা নরম রাখা, হৃদরোগ ও কোন কোন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানো ইত্যাদি ।

ডায়াবেটিক ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরীর উৎস

- শর্করা থেকে ৫০-৬০%
- আমিষ থেকে ১০-২০%
- চর্বি থেকে ৩০%
- এছাড়াও আঁশ জাতীয় খাবার প্রতিদিন ২০-৩৫ গ্রাম
- লবন প্রতিদিন ৫ গ্রাম-এর কম ।

ডায়াবেটিক ব্যক্তির প্রতিদিনের খাদ্যের বিভাজন

- সকালের নাস্তায় খাবে মোট ক্যালরী ২০%
- দুপুরের খাবারে খাবে মোট ক্যালরী ৩৫%
- রাতের খাবারে খাবে মোট ক্যালরী ৩০%
- বাকী ১৫% ক্যালরী ২-৩ টা টিফিনে বিভক্ত করে নেয়া ।

কম ক্যালরী বিশিষ্ট চিনির বিকল্প

- এ্যাস্পার্টেম্
- নিওটেম্
- স্যাকারিন্
- সুক্রালোজ্
- এসিসালফেম্ ।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শারীরিক পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সুনির্দিষ্টভাবে যে শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাই ব্যায়াম । ব্যায়াম ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে গ ুকোজের ব্যবহার বাড়ায় এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ব্যায়াম আরো যে সকল উপকার করে থাকে সেগুলো হলো:

- হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে
- রক্তের চর্বি নিয়ন্ত্রণ করে
- হাড়ের জোড়ার সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ায়
- স্থূলতা কমিয়ে দেয়
- মাংসপেশীর রক্ত সঞ্চালন ও ক্ষমতা বাড়ায়
- জড়তা, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ কমায় ।

ব্যায়ামের ধরন

- অ্যারোবিক
  ১. মাঝারী তীব্রতার ব্যায়াম
    - দ্রুত হাঁটা
    - সাইকেল চালানো
    - সাঁতার কাটা
    - নাচা ইত্যাদি

  ২. ভারী ব্যায়াম
    - খুব দ্রুত হাঁটা
    - জগিং করা
    - দ্রুত সাঁতার কাটা
    - দ্রুত নাচা
- অ্যানঅ্যারোবিক
  - ভারোত্তোলন
  - খুব দ্রুত দৌড়ানো (অল্প সময়) ।

ব্যায়াম শুরুর আগে করণীয়

- পর্যাপ্ত পানি পান করা
- মাপমত জুতা পরা
- অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়ায় ব্যায়ামের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা
- হঠাৎ করে অনেক বেশী ব্যায়াম না করে ধীরে ধীরে অভ্যাস তৈরী করা
- ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে বের হবার সময় ব্রেসলেট বা এ জাতীয় কোন পরিচয় বাহক সঙ্গে রাখা
- সঙ্গে এমন কাউকে নিয়ে ব্যায়ামে যাওয়া যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা করতে জানে ।

ব্যায়ামের সেশন

F Warm-up সেশনের ৫-১০ মিনিট সময়ে শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যঙ্গ ব্যায়ামকালীন সময়ের অতিরিক্ত চাপ নিতে প্রস্তুত হতে পারে

C Warm-up সেশনের পর পর মাংসপেশীর সঞ্চালন বাড়াতে ৫-১০ মিনিট stretching করা জরুরী

ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট মাঝারী তীব্রতার অথবা ৭৫ মিনিট ভারী তীব্রতার অ্যারোবিক ব্যায়াম করা উচিৎ এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন সপ্তাহে পর পর ২ দিনের বেশী ব্যায়ামহীন দিন না থাকে ।

মূল ব্যায়াম শেষ হবার পর ৫-১০ মিনিট Cool-down সেশন হৃদযন্ত্রসহ শরীরের অন্যান্য অংগ প্রত্যঙ্গকে ব্যায়াম পূর্ববতী অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে ।

ব্যায়াম সম্পর্কে লক্ষণীয়

⊗ রক্তের গ্লুকোজ খুব বেশী থাকা অবস্থায় (৩০০ মি.গ্রাম/ডিএল) ব্যায়াম করা উচিৎ নয়
⊗ গ্লুকোজ কমে গেলে (১০০ মি.গ্রাম/ডিএল) কিছু নাস্তা খেয়ে ব্যায়াম করতে যাওয়া উচিৎ
⊗ যে কোন জরুরী শারীরিক অবস্থায় (জ্বর, বমি ইত্যাদি) ব্যায়াম করা যাবে না
⊗ রক্তচাপ অতিরিক্ত বেশী থাকলে তখনও ব্যায়াম করা উচিৎ নয়
⊗ ডায়াবেটিসের যে কোন ধরনের জটিলতা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম নির্ধারণ করা উচিৎ ।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ঔষধ

ডায়াবেটিস চিকিৎসার ঔষধগুলো মূলতঃ দুই ধরণের ঃ

১. মুখে খাওয়ার ঔষধ এবং
২. ইনসুলিন ও অন্যান্য ইনজেকশনে ব্যবহৃত ঔষধ ।

মুখে খাবার ঔষধ (OAD-Oral antidiabetic drugs)

কাজের ধরণ অনুযায়ী মুখে খাওয়ার ঔষধগুলোকে মূলতঃ ৪ ভাগে ভাগ করা যায় ।

১. ইনসুলিন নিঃসরণ বর্ধনকারী (Insulin secretagogues)

⊗সালফোনাইল ইউরিয়া
- গ্লিবেনক্লামাইড
- গ্লিক্লাজাইড
- গ্লিপিজাইড
- গ্লিমেপিরাইড

⊗নন- সালফোনাইল ইউরিয়া
- রিপাগ্লিনাইড
- ন্যাটিগ্লিনাইড

২. ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বর্ধণকারী (Insulin sensitizers)
- বাইগুয়ানাইড
- থায়াজোলিডিনডিওন

৩. অন্ত্রে গ্লুকোজের শোষণ প্রতিরোধকারী
- আলফা গ্লুকোসাইডেজ ইনহিবিটর

৪. অন্যান্য- সিটাগ্লিপটিন, ভিলডাগ্লিপটিন, লিনাগ্লিপটিন।

ডায়াবেটিসের জটিলতা

ক. ডায়াবেটিসের স্বল্পমেয়াদী জটিলতা

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকে নানা ধরনের জটিলতা তৈরী হবার ঝুঁকি থাকে। এ ধরণের জটিলতার ভিতর কয়েকটি রক্তের গ্লুকোজের মাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনের সাথে জড়িত। এগুলোকে ডায়াবেটিসের স্বল্পমেয়াদী জটিলতা বলে। যেমন, রক্তের গ্লুকোজ অনেক বেড়ে গিয়ে হতে পারে DiabeticKetoacidocis (DKA) অথবা Hyperosmolar non-ketotic Coma (HONK)। আর গ্লুকোজ মারাত্মক কমে গেলে সে অবস্থাকে Hypoglycemia বলে।

খ. ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা

অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শরীরে বিভিন্ন রক্তনালীতে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। আক্রান্ত রক্তনালীর আকার অনুযায়ী এ সকল জটিলতা গুলোকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. Micro vascular complication

শরীরের বিভিন্ন ছোট ছোট রক্তনালী আক্রান্ত হয়ে যে সকল জটিলতা সৃষ্টি হয় সেগুলো Micro-vascular complications হিসেবে চিহ্নিত। এগুলো হলো-

- চোখের সমস্যা/ Retinopathy
- কিডনীর সমস্যা/ Nephropathy
- স্নায়ুবিক সমস্যা/ Neuropathy।

২. Macro-vascular complications

অপেক্ষাকৃত বড় আকারের রক্তনালী আক্রান্ত হয়ে এধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই ধরনের জটিলতাগুলো হলো ঃ

- হৃৎপিন্ডের রক্তনালীর সমস্যা/ Coronary artery disease (CAD)
- মস্তিস্কের রক্তনালীর সমস্যা/ Cerebro-vascular disease (CVD)
- পায়ের রক্তনালীর সমস্যা/ Peripheral vascular disease (PVD)|

জটিলতা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা
- রক্তের চর্বি নিয়ন্ত্রণ করা
- ওজন নিয়ন্ত্রণ করা
- ধুমপান/তামাক বর্জন করা
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।

ডায়াবেটিস ও গর্ভাবস্থা

ডায়াবেটিস ও মাতৃত্ব দু'ধরনের হতে পারে-

⊗ ডায়াবেটিক মহিলারা গর্ভধারণ করলে (ডায়াবেটিসে গর্ভধারণ)

⊗ গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হওয়া (গর্ভকালীন ডায়াবেটিস)।

গর্ভাবস্থায় রক্তের গ্লুকোজ বেশী থাকার প্রভাব

মায়ের উপর

- সময়ের আগে সন্তান প্রসব
- প্রি- একলাম্পশিয়া
- সিজারিয়ান সেকশন
- পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়া।

শিশুর উপর (ভ্রুণ ও জন্মের পর)

- বড় বাচ্চা হওয়া
- জন্মগত ত্রুটি
- মৃত শিশু জন্ম হওয়া
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া
- জন্মের সময় আঘাত জনিত সমস্যা
- জন্ডিস
- পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়া ।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (GDM- Gestational Diabetes Mellitus)

Placenta হতে আসা হরমোনগুলো অনেক বেড়ে যায়, যা ইনসুলিনকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দেয় না । ফলে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায় । এ অবস্থাই GDM ।

কখন পরীক্ষা করতে হবে ঃ

- যারা কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাদের গর্ভধারণের ২৪-২৮ সপ্তাহে পরীক্ষা করাই যথেষ্ট
- যারা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাদের আরও আগে পরীক্ষা করতে হয়; তখন ডায়াবেটিস ধরা না পড়লে পুনরায় গর্ভধারণের ২৪-২৮ সপ্তাহে পরীক্ষা করতে হয় ।

উচ্চ ঝুঁকিপূণ (High risk) গর্ভাবস্থা যাদের

- বয়স ২৫ বছর বা বেশী
- পরিবারের অন্য কারো ডায়াবেটিস আছে
- ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী (BMI ২৩ বা তার উপর)
- আগের গর্ভকালীন সময়ের খারাপ ইতিহাস (বড় বাচ্চা, মৃত বাচ্চা ইত্যাদি) আছে
- পূর্বে GDM, IFG বা IGT এর ইতিহাস থাকলে ।

কিভাবে পরীক্ষা করতে হয়

- ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ শরবত খাইয়ে আদর্শ নিয়মানুযায়ী OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) করা হয়
- খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ (FBG) ৫.১ মিমোল/লি বা বেশী হলে এবং অথবা গ্লুকোজের শরবত খাওয়ানোর ১ ঘন্টা পর ১০.০ মিমোল/লি বা তার বেশী হলে এবং ২ ঘন্টা পর ৮.৫ মি.মোল/লি বা তার বেশী হলে ডায়বেটিস হয়েছে ধরে নিতে হবে ।

সঠিক নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো

- প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যবস্থা
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম
- প্রয়োজনে ইনসুলিন ।

নবজাতকের যত্ন

ডায়াবেটিক মায়েদের বাচ্চার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবার ঝুঁকি থাকে । তাই জন্মের ৩০-৬০ মিনিটের ভিতর রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিরতিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত ।

GDM - প্রসব পরবর্তী Follow-up

প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর OGTT করা উচিত এবং এ সময় ডায়াবেটিস ধরা না পড়লে প্রতি ৩ বছর অন্তর একবার OGTT করে দেখা উচিত ।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস নিরাময়যোগ্য রোগ নয়, এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করাও সম্ভব নয়, কেবল সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বিভিন্ন গবেষণা করে দেখা গেছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস বহুলাংশে প্রতিরোধ করা যায়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধের উপায় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওজন নিয়ন্ত্রণ,স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম, গর্ভকালীন যত্ন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ব্যবহার করেও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাফল্য পাওয়া গেছে। তবে জীবন-যাপন প্রণালীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধই বিশ্ব জুড়ে বেশী সমাদৃত।

পূর্ব মূলায়নপত্র
পূর্ণমান-১০০
সময়: ৩০ মিনিট

১. HPNSP কি?

২. SDG কি?

৩. স্বাস্থ্য সহকারী কে? তার ৩টি দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখুন ।

৪. সুপারভিশন কি ?

৫. শিষ্টাচার কি ?

৬. শ্রান্তি বিনোদন ছুটি কি?

৭. অটিজম কি ? ২টি লক্ষণ লিখুন ।

৮. NCDC বলতে কি বুঝেন?

৯. চিকুনগুনিয়া কি ধরনের রোগ ?

১০. ডায়াবেটিস কি ? টাইপ বলতে কি বুঝেন?

১১. ইনসুলিন কি ?

১২. সিএইচসিপি কে? তাঁর দুইটি করে দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখুন ।

১৩. স্বাস্থ্য পরিদর্শক কে? তাঁর দুইটি করে দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখুন ।

১৪. সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক কে? তাঁর দুইটি করে দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখুন ।

১৫. ডায়াবেটিসের ২টি লক্ষণ লিখুন ?

১৬. BCC কি?

১৭. EPI কি?

১৮. কমিউনিটি ক্লিনিক কি, কোথায় অবস্থিত ?

১৯. কমিউনিটি ক্লিনিকে কে কে বসেন ?